LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭২ বর্ষ ■ ১৩শ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ ■ ২ মাঘ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ ■ ২৮ মহররম, ১৪৩১ হিজরি ■ ১৫ সুলাহ্, ১৩৮৯ হি. শা. ■ ১৫ জানুয়ারি, ২০১০ ঈসাব্দ

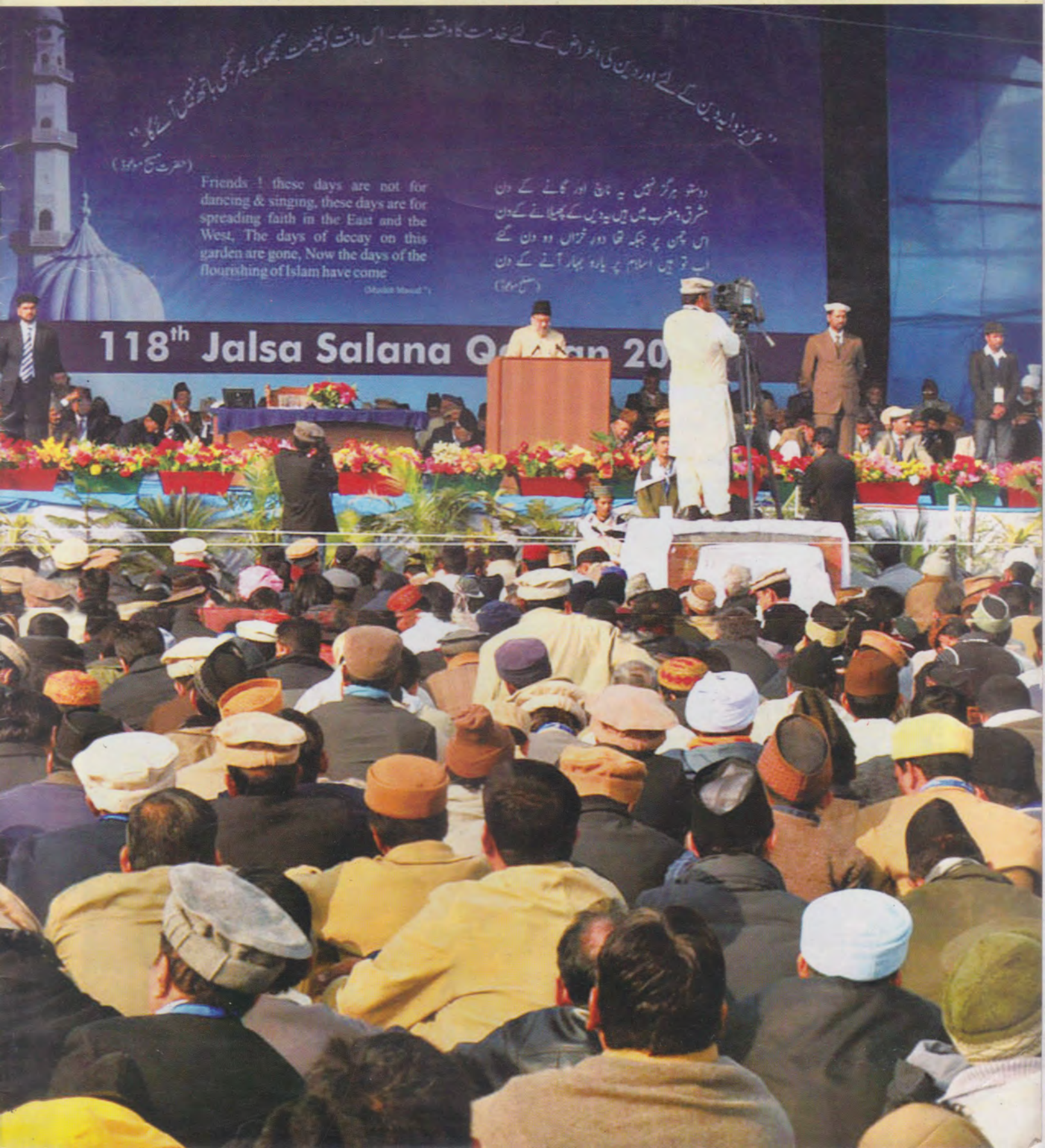

"عزیزو! یہ دین کے لئے اور دین کی اغراض کے لئے خدمت کا وقت ہے۔ اِس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔"
(حضرت مسیح موعودؑ)
Friends ! these days are not for dancing & singing, these days are for spreading faith in the East and the West, The days of decay on this garden are gone, Now the days of the flourishing of Islam have come
(Musleh Maood ")
دوستو ہرگز نہیں یہ ناچ اور گانے کے دن
مشرق ومغرب میں ہیں یہ دیں کے پھیلانے کے دن
اس چمن پر جبکہ تھا دور خزاں وہ دن گئے
اب تو ہیں اسلام پر یارو بہار آنے کے دن
(مصلح موعودؓ)
118th Jals
ana Qadian 2009

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা সালানা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের এক মিলন মেলা

সারা বিশ্ব আজ চরম অশান্তি আর নানা অবক্ষয়ে জর্জরিত। যেদিকেই লক্ষ্য করি না কেন শুধু অবক্ষয় আর অবক্ষয়। সকলেই আজ দিশেহারা হয়ে খুঁজছে এ অবক্ষয় থেকে মুক্তির পথ। আজ অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, কোন নীতিই যেন মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারছে না। মানুষের চিন্তা চেতনা ও কর্মে এই যে অবক্ষয়, এথেকে মানুষকে মুক্ত করে সহজ সরল পথে এবং শান্তির সফল ঠিকানায় পৌছাতে পারে পবিত্র কুরআন মজীদের শিক্ষা। আজ সর্বত্র এই যে অবক্ষয় এর মূল কারণ যদি আমরা খুঁজে দেখি তাহলে অবশ্যই সবাই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আমরা খোদা প্রদত্ত শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে আছি বলেই পৃথিবীতে এত অরাজকতা ও নৈরাজ্য। আমরা যদি কুরআন মজীদের শিক্ষা মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করি তাহলেই পৃথিবী ফিরে পেতে পারে শান্তির সন্ধান।

আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এক অন্ধকার যুগে আলোর প্রভা দেখিয়েছে এই কুরআন ও এর মহান বাহক খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি (সা.) পশুতুল্য জাতিকে ফিরিশ্‌তাতুল্য করে জগতের সামনে উপস্থাপন করে এক মহা বিপ্লব সাধন করেছেন। আজও এ অন্ধকার যুগে আলোর পথ দেখানোর জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুরআনের সঠিক শিক্ষা নিয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হয়ে এসেছেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর খোদা তাআলা প্রদত্ত অর্পিত দায়িত্বাবলী সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার অংশ হিসেবেই ১৮৯১ সালে ভারতের কাদিয়ানে সালানা জলসার প্রবর্তন করেন।

সেদিন মাত্র ৭৫ জন পুণ্যাত্মা নিয়ে এ জলসা শুরু হয়েছিল। আজ এরই অনুসরণে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উপস্থিতির সংখ্যা লক্ষের কোটাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এবারের কাদিয়ানের জলসায় প্রায় ২০ হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার ভাগী হন। বাংলাদেশ থেকেও বেশ কয়েকজন কাদিয়ানের বরকতমন্ডিত জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

১৫ জানুয়ারী ২০১০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
● কুরআন শরীফ	২
● হাদীস শরীফ	৩
● অমৃত বাণী	৪
● জুমুআর খুতবা ঃ *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৫-১২
● নেযামে নও (নব বিশ্বব্যবস্থা) *হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)*	১২-১৫
● ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত	১৬-১৮
● আমরা যা বলছি কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	১৯-২০
● খিলাফত–মুসলিম ঐক্যের খোলাপথ মাহমুদ আহমদ সুমন	২১-২২
● খিলাফত হারা মুসলমানদের অমানবিক কর্মকান্ড সংগ্রহ : ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ	২২-২৩
● হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৪-২৭
● নবীনদের পাতা	
* মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি	২৮-২৯
* প্রতিমা পূজারীদের প্রতি এক আন্তরিক আহ্বান	৩১-৩১
* দরূদ শরীফ পাঠ	৩২
* প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক	৩২-৩৩
● সংবাদ	৩৬

প্রচ্ছদ : দারুল আমান কাদিয়ানের ১১৮তম সালানা জলসা-২০০৯

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আগামী ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১০ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমরা যারা এ মহান জলসায় যোগদানের সুযোগ পাচ্ছি, তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে উদ্দেশ্যে এ জলসার শুভ সূচনা করেছিলেন সে উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রেখে সেই অনুযায়ী প্রতিটি মূহুর্ত অতিবাহিত করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকল দুর্বলতা ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং জলসায় যোগদানের তৌফিক দিন, আমীন!

সূরা হুদ-১১

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ وَّاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٨٠﴾

৮০। তারা (কথা ঘুরিয়ে) বললো, 'তুমি নিশ্চিতভাবে জানো তোমার কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নেই এবং আমরা যা চাচ্ছি তুমি অবশ্যই তা খুব ভালভাবে জান[১৩৩৮]।'

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨١﴾

৮১। সে বললো, 'হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু করার শক্তি আমার থাকতো, বা আমি এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় নিতে পারতাম[১৩৩৮-ক]!'

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۭ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۭ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۭ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨٢﴾

৮২। তারা (অর্থাৎ মেহমানরা) বললো, 'হে লূত! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (প্রেরিত) দূত[১৩৩৯]। তারা কিছুতেই তোমার নাগাল পাবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোন এক প্রহরে তোমার পরিবারপরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড় আর তোমাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে তোমার স্ত্রীর কথা ভিন্ন। (কেননা) তাদের জন্য আসন্ন শাস্তি তার ওপরও নেমে আসবে। নিশ্চয় তাদের (ধ্বংসের) প্রতিশ্রুত সময় হলো প্রভাতকাল। প্রভাত কি খুবই নিকটে নয়?'

১৩৩৮। হযরত লূত (আ.) যখন শহরের মধ্যে বিবাহিতা কন্যাদেরকে (আদি ২৯:১৫) জামিনস্বরূপ পেশ করলেন, তারা এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলল যে, নারীদের জামিন গ্রহণ করা তাদের নীতির বিরুদ্ধ (এনসাইক্লো: ব্রিটা)। 'তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন দাবী নাই' এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, অধিকাংশ তফসীরকারকগণ কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্যে তারা আসেনি; কারণ লূত (আ.)-এর জাতির লোক, যারা নৈতিকভাবে এরূপ লম্পট ও নীতি ভ্রষ্ট হয়েছিল, তারা তাদের কাম লোলুপ বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে ন্যায় অন্যায়ের যুক্তি উত্থাপন করতেই পারে না। 'আমরা যা চাই, তুমি নিশ্চয় অবগত আছ' এই বাক্য দ্বারা এটাই ইঙ্গিত করছে; তুমি জান যে, অপরিচিতদেরকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, এটাই চাচ্ছি।

১৩৩৮-ক। আমার মেহমানদের গৃহের বাইরে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্য তোমাদের জবরদস্তি-মূলক আক্রমণের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

১৩৩৯। 'প্রেরিতগণ' কোন প্রতিবেশী-অঞ্চলের ওলী-আল্লাহ্ ছিলেন, এবং তারা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে লূত (আ.)-কে সতর্ক করত: হিজরতের উদ্দেশ্যে তাঁর গন্তব্যস্থলের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে এসেছিলেন।

১৩৩৯-ক। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত লূত (আ.)-এর জাতি ভয়ানক ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল। প্রচন্ড ভূমিকম্পের কারণে কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠ উলট-পালট হয়ে যায় এবং বিদীর্ণ ভূমি খন্ড-বিখন্ড হয়ে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে ও পুন: নীচে পতিত হয়।

হাদীস শরীফ

মু'মিনগণের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালবাসা

কুরআন :

'মু'মিনদের প্রতি তোমার (মমতার) ডানা ঝুঁকিয়ে রাখ' (সূরা আল হিজর ১৫ ঃ ৮৯)

হাদীস ঃ *আনিন নু'মান ইবনে বাশীরিন ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মাসালুল মু'মিনীনা ফী তাওয়াদ্দুহিম ওয়া তারাহহুমিহিম ওয়া তাআতুফিহিম মাসলুল জাসাদে, ইয়াশতাকা মিনহু উযুউন তাদাআ লাহু সায়েরুল জাসাদে, বিস্সাহারে ওয়াল হুমা।*

অনুবাদ ঃ নু'মান ইবনে বশীর হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া অনুগ্রহ মায়া-মমতার দিক হতে সব মুসলমান এক দেহ তুল্য। দেহের একটি অংশ যদি অসুস্থ্য হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায় হোক অথবা জ্বরের অবস্থায় (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, সমগ্র মানবজাতিকে ভ্রার্তৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে এক জাতিতে রূপান্তরিত করা। তাই উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদের মহান নবীকে সম্বোধন করে তাঁর (সা.) উম্মতকে এ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, পরস্পরের প্রতি নম্রতার বাহু প্রসারিত কর। বস্তুত নম্রতাই হলো সেই অমুল্য উপাদান যা মানুষের মাঝে বিনয়, দয়া, করুণা, ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি করে। আজ মানব সভ্যতা চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে। তবুও হতবাক দৃষ্টিতে দেখতে হয় যে, এ সভ্য জগত সভ্যতার নামে যা করছে তা অসভ্য জাতিগুলোর মাঝে স্বল্পই বিদ্যমান ছিল। চতুর্দিকে রক্ত বইছে, ভাইয়ের হাতে ভাই, পুত্রের হাতে পিতা, পিতার হাতে পুত্র খূন হচ্ছে। এসব তো রয়েছেই, আরো রয়েছে প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রসারের লোভ- লালসায় মত্ত হয়ে দেশে দেশে হানাহানি। অবরোধের নামে নিষ্পাপ শিশুসহ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের নির্মম মৃত্যুর শিকারে পরিণত হওয়া, আর এ মৃত্যু ঘটানোয় সহায়তা দিচ্ছে তাদেরই আপনজন।

ইসলাম এসবকিছুকে মিটিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যের তানে এক করতে চায়। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, সমগ্র মুসলমান এক দেহের ন্যায়। কিন্তু আজ তাঁর (সা.) উম্মত সে শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের পরিচয় তথাকথিত নানা সীমারেখার সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। কেউ ইরাকী, কেউ ইরানী কেউ লিবিয়ান আর কেউবা মিশরীয়। অর্থাৎ নিজেদের মুসলমান বললেও একতা কিন্তু আজ খন্ড-বিখন্ড। আজ যদি মুসলমান জাতি নিজেদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে চায় তবে আবারও তাদেরকে আজ ঐক্যের আওয়াজ তুলতে হবে, যেখানে আছে ভালোবাসা আর পরস্পরের প্রতি মমতা ও সম্মানবোধ।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনও সে উদ্দেশ্যেই যাতে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে এক দেহে রূপান্তরিত করে বিশ্ববাসীর সামনে অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্র করা যায়। আমরা এজন্যেই তার (আ.) হাতে বয়াত নিয়েছি। তাই আমরা কখনও যেন কুরআন ও মহানবীর (সা.) শিক্ষাকে না ভুলি। নিজেদের মাঝে স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার উৎকৃষ্ট নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে আহমদীয়া খিলাফতের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে বিশ্ববাসীকে যেন ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখাতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় মর্যাদা প্রকাশে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'যেহেতু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং রাসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, সর্বোন্নত ছিলেন, সেহেতু খোদা তাআলার এই অভিপ্রায়ও ছিল যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজস্ব সত্তার মনি-মুক্তোর নিরিখে বাস্তবিক পক্ষেই যেমন সকল নবীদের নেতা, তেমনিভাবে প্রকাশ্য খেদমতের নিরিখেও তাঁর (সা.) সকলের ওপরে উন্নত ও উত্তম হওয়াটাও প্রকাশিত হোক, উদ্ভাসিত হোক। এজন্যই খোদা তাআলা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সকল বনী আদমের জন্য সার্বজনীন রূপে আবির্ভূত করেছেন, যাতে করে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সমূহ সার্বজনীনভাবেই প্রকাশিত হয়, এবং তা মূসা এবং ইবনে মরিয়মের মত বিশেষ ক'টি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এবং তিনি সকল দিক থেকে সকল জাতির জুলুম ও নির্যাতন সইবার দরুন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের অধিকারী হবেন যা অন্য আর কোন নবীই লাভ করবেন না।'

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজস্ব সত্তার মনি-মুক্তোর নিরিখে বাস্তবিক পক্ষেই যেমন সকল নবীদের নেতা, তেমনিভাবে প্রকাশ্য খেদমতের নিরিখেও তাঁর সকলের ওপরে উন্নত ও উত্তম হওয়াটাও প্রকাশিত হোক, উদ্ভাসিত হোক।

'আমি বিশ্বাস করি যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পৃথক করা যেত, এবং সমস্ত নবী যারা ঐ সময় পর্যন্ত অতীত হয়ে গেছেন, তারা সবাই একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে সেই কাজ ও সেই সংশোধন করতে চাইতেন, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেছেন তবে তা কিছুতেই করতে পারতেন না। তাঁদের মধ্যে সেই হৃদয় ও সেই শক্তি ছিল না, যা আমাদের নবী (সা.)কে দান করা হয়েছিল। কেউ যদি বলে যে, এ তো নবীদের প্রতি (মায়াজ আল্লাহ্) দারুন বেআদবী! তাহলে, আমার প্রতি সেই নাদান বা মূর্খের পক্ষ থেকে অপবাদ আরোপ করা হবে। নবীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করাকে আমি আমার ঈমানের অঙ্গ বলে জানি, কিন্তু সকল নবীদের ওপরে নবী করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে আমার ঈমানের সর্বপ্রধান অঙ্গ, তা আমার শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। এবং তা আমি বের করে দেই, সে এখতিয়ার আমার নেই। হতভাগ্য ও দৃষ্টিহীন বিরুদ্ধবাদীরা যা খুশী বলতে পারে। তবে, (সত্য এটাই যে) আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেছেন, তা অন্যদের দ্বারা না পৃথকভাবে, না সমবেতভাবে সমাধা হতে পারতো। এবং এ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ফজল। আর এটাই হলো আল্লাহ্র ফজল বা কৃপা, তিনি যাকে চান দান করেন।

(মালফুযাত, ২য় খন্ড পৃ: ১৭৪)

স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমতাধরদের চেয়েও ক্ষমতাবান, তিনি তাঁর (সৃষ্ট) সব কিছুর ওপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তারকারী। নিবেদিত অন্তরে নামায পড়, দোয়াতে লেগে থাক, নিজের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়জনদেরও এ শিক্ষাই দাও। খোদার প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হলে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ক্ষতির মূলে হল– পাপ।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস কর্তৃক
মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে
৯ অক্টোবর ২০০৯/ ৯ ইখা ১৩৮৮
হিজরী শামসী প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد ان
محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فاعوذ بالله
من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (آمين)

কুরআন করীমের বেশ কয়েকটি স্থানে আল্লাহ্ তাআলার 'কাভী' অর্থাৎ পরম শক্তিশালী হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ 'কাভী' আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণবাচক নাম। মানুষের জন্য সাধারণভাবে শারীরিক ও মেধাগত শক্তি সামর্থ্য রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এছাড়া কোন কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য রাখা এবং জ্ঞানের দিক থেকে দৃঢ় যুক্তি-প্রমাণের অধিকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার জন্য আমরা যখন 'কাভী' শব্দ ব্যবহার করি তখন এর অর্থ হবে তিনি সব ধরনের শক্তির অধিকারী। এক্ষেত্রে কেউই তাঁর প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে না। তিনি সব শক্তিমানের তুলনায় অধিক শক্তিশালী এবং সকল শক্তিরই অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টিকেও বিভিন্ন ধরণের শক্তিসামর্থ্য দান করার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শক্তিশালী করে থাকেন। যেভাবে আমি বলেছি, কুরআন করীমে বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এ গুণবাচক নামের উল্লেখ করেছেন।

যেখানেই তিনি (তাঁর এ গুনবাচক নামের) উল্লেখ করেছেন সেখানেই (তিনি তা) সতর্ক করার জন্য বা কোন মন্দ পরিনামের বিষয়ে ভয় দেখানোর জন্য বা মন্দ পরিনাম সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য করেছেন। অথবা সে সব লোকের পরিনামের কথা উল্লেখ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তাআলার কথা শোনে নাই এবং এজন্য তাদের ওপর আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি নাযিল হয়েছে। সেখানে তিনি এও বলেছেন- আল্লাহ্ তাআলাকে যারা সমস্ত শক্তির আধার ও সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে তারা আল্লাহ্ তাআলার কৃপার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যে সব মুশরেক আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সর্ব প্রথম সূরা বাকারায় সতর্ক করে বলেছেন এ শিরক তাদেরকে আযাবের লক্ষ্যস্থলে পরিনত করবে। কিন্তু এর সাথেই মু'মিনদের নিদর্শন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, মু'মিনরা আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসাকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়। সূরা বাকারার ১৬৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا
يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا
لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ
اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۶﴾

অর্থাৎ লোকদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে নেয়। তারা তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বাধিক ভালবাসে। যারা অত্যাচার করেছে, হায়! তারা যদি (আযাব এখনই) প্রত্যক্ষ করতে পারত

যেমন তারা আযাবকে (পরে) প্রত্যক্ষ করবে (তবে তারা বুঝত) আল্লাহই সমস্ত শক্তির আধার এবং আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর। এ আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসা এবং তাঁকে স্মরণ রাখা। কিন্তু কোন কোন মানুষ এ উদ্দেশ্যকে ভুলে যায় বরং এ দিকে মনোযোগই দেয় না।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা সম্পর্কে জানেই না এবং তা বুঝবারও চেষ্টা করে না। বরং এর বিপরীতে হয় তারা বাহ্যিক প্রতিমার পূজা-অর্চনা করে নয় তো বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা হৃদয়ে বানিয়ে নেয়। এমন লোকদের হৃদয়ে এগুলোর প্রতি ভালবাসা এতো দৃঢ়তর ভাবে প্রোথিত হয়ে যায় যে আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসার বিষয়টি তাদের ধ্যান-ধারনাতেও থাকে না। পক্ষান্তরে একজন প্রকৃত মু'মিন তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসাকে সব ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেয়। অতএব এ আয়াতে যেখানে আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের জন্য এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, তোমরা মনে করেছো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি ভালবাসা তোমাদেরকে উপকৃত করতে পারবে। কিন্তু স্মরণ রেখো! সে সবই শক্তিহীন এবং সেগুলোর মাঝে কোন শক্তি নেই। প্রকৃত শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। আল্লাহ্ তাআলা অন্য এক স্থানে বলেছেন, যারা শিরক করবে আমি তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবো না।

কাজেই এ পৃথিবীর সাময়িক ভোগবিলাস তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে তোমাদেরকে মন্দ পরিনামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অন্য দিকে মু'মিদেরকে বলেছেন, তোমরা যদি মু'মিন হওয়ার দাবী কর তবে (জেনে রেখো,) সে-ই প্রকৃত মু'মিন যে আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বাধিক ভালবাসে (এবং আল্লাহর প্রতি) তার ভালবাসা সব ভালবাসার ওপর প্রাধান্য পায়। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সে যেসব পুরস্কার পাবে তা কেবল আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসার জন্যই পাবে। আল্লাহ্ তাআলার সাথে ভালবাসা হলে তা আল্লাহ্ তাআলার প্রেমিকের ভালবাসার দিকে পথনির্দেশ দেয়। অতএব, একজন মু'মিনকে সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার ভালবাসা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন তাঁর (আল্লাহ্র) রাসূল (সা.) এর সাথেও তার নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকবে। **ফাত্তাবিউনী ইউহবিবকুমুল্লাহ** এর বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করতে হবে। মহানবী (সা.) এর প্রতি দরূদ ও আশিস কামনার মাধ্যমে নিজের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। এ দুটি ভালবাসার ওপর পৃথিবীর অন্য কোন ভালবাসার প্রাধান্য পাওয়া সমীচিন নয়। এছাড়াও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা পোষণ করতে বলেছেন, তাই আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভের জন্য অন্যান্য মানুষকেও ভালবাসা প্রয়োজন। এরপর বলেন, মুশরিকরা তো ইচ্ছেমত শিরক করে চলেছে (কিন্তু এর শাস্তি) তাদের ওপর আপতিত হবেই।

কিন্তু খোদা তাআলাকে ভালবাসার ফলে যে ভালবাসার সৃষ্টি হওয়া উচিত, মু'মিন হওয়ার দাবিকারকরা যদি এর প্রতি দৃষ্টি না দেয় তবে তারা নিজের প্রাণের ওপর যুলুম করবে। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম **কাভি** (অর্থাৎ পরম শক্তিশালী) কে গুরুত্ব দিবে না এবং তাঁর প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করবে না। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের পাকড়াও করে ফেলেন কিন্তু এ সম্পর্কে এসব লোকদের দৃষ্টি থাকে না।

সুতরাং এক মু'মিনের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ তার মহা শক্তিশালী খোদার মাহাত্মকে উপলব্ধি করে এবং তাঁকে সকল শক্তির অধিকারী মনে করে নেয়া উচিত। সুতরাং মুশরিকদের এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য মিথ্যা উপাসকদের প্রাধান্যদানকারীদেরকে যেখানে আল্লাহ্ তাআলা তাদের মন্দ পরিণাম এবং আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাদের ঘটনা সমূহ বর্ননা করেছেন, সেখানে মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার গভীরে প্রবেশ করে তা অন্বেষণের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই ভালবাসা কেমন হওয়া উচিত, এর গভীরতা এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'জেনে রাখা উচিত, ভালবাসা কোন কৃত্রিমতা এবং লৌকিকতার কাজ নয়। বরং মানবীয় শক্তির মধ্যে এটিও একটি শক্তি। এর প্রকৃত তত্ত্ব হল, কোন বিষয়কে মন দিয়ে পছন্দ করার পর সে দিকে আকর্ষিত হওয়া এবং যেভাবে প্রতিটি জিনিসের আসল বৈশিষ্ট্যাবলী এর চরম উৎকর্ষতার সময়ে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়।' ভালভাবে অনুভব করা যায়। 'ভালবাসার প্রকৃত অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে। এটি যখন এর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন স্তরে উপনীত হয় তখন এর মনিমুক্তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।' ভালবাসা যখন নিজের চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন এই ভালবাসার মণিমুক্তা, এর ফলাফল এবং এর গুণাবলী প্রকাশ পায়।

'তিনি (আ.) বলেন **উশরেবু কুলুবিহিম** ..... অর্থাৎ গোবৎসের প্রতি তাদের এত ভালবাসা ছিল যেন গোবৎসের ভালবাসা তাদেরকে শরবতের ন্যায় পান করিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে যে ব্যক্তি কাউকে

পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে সে যেন তাকে পান করে ফেলে। অথবা তাকে গ্রাস করে ফেলে এবং তার চারিত্রিক গুনাবলী ও তার আচার-আচরণকে (নিজের মাঝে) ধারণ করে। ভালবাসা যত গভীর হবে মানুষ স্বভাবত তার প্রেমাস্পদের গুণাবলীর প্রতি ততই আকর্ষিত হতে থাকবে। এমনকি সে যাকে ভালবাসে তার রূপ ধারণ করে। খোদাকে যে ব্যক্তি ভালবাসে সে তার যোগ্যতানুযায়ী প্রতিচ্ছায়ারূপে সেই নূরকে অর্জন করে নেয় যা খোদা তাআলার সত্ত্বায় রয়েছে, এটাই হল নিগূঢ় রহস্য। শয়তানকে যারা ভালবাসে তারা সেই অন্ধকার পেয়ে থাকে যা শয়তানের মধ্যে রয়েছে।' তিনি (আ.) বলেন 'প্রকৃত ভালবাসা এ বিষয়ের দাবি রাখে, মানুষ যেন সত্যনিষ্ঠার সাথে তার প্রেমাস্পদের সমস্ত অভ্যাস, চারিত্রিক গুনাবলী ও ইবাদত সমূহ পছন্দ করে এবং তাতে বিলীন হওয়ার জন্য মনে প্রাণে সচেষ্ট থাকে। তার প্রেমাস্পদের মাধ্যমে সে যেন সেই জীবন লাভ করার চেষ্টায় রত থাকে যা প্রেমাস্পদ অর্জন করেছে। প্রকৃত প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং **নিজ প্রেমিকের অন্তরের মাধ্যমে (নিজেও) প্রকাশিত হয়।' অর্থাৎ প্রেমিকের হৃদয়ে সব সময় তার ছবি থাকে। 'সে এমন ছবি তার হৃদয়ে এঁকে নেয় যেন সে তাকে পান করেছে।** বলা হয়- তার মধ্যে বিলীন হয়ে, তার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে এবং তার মাঝে একীভূত হয়ে মানুষের মাঝে প্রকাশ করে দেয়, আসলেই সে তার ভালবাসার মাঝে ডুবে গেছে।

'হাব্ব' একটি আরবী শব্দ। আর এর আসল অর্থ হচ্ছে নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া। সুতরাং আরবে এ প্রবাদ বহুল প্রচলিত, **'তাহাব্বাবাল হেমারো'** সাধারণ অর্থে গাধার পেট পানিতে ভরে গেছে। কিন্তু যে বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য আরবরা **'তাহাব্বাবাল হেমারো'** বলে থাকে তা হলো ভালবাসার পানিতে তার পেট ভরে গেছে। উটের পেট পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তারা বলে **'শারেবাতিল ইবেলো হাত্তা তাহাব্বাবা'** অর্থাৎ উটের পেট পানিতে ভরে গেছে। আর শষ্যদানাকেও **'হাব্ব'** বলা হয়। যে কোন শষ্যদানাকে হাব্ব বলা হয়। এ (শব্দ)টিও এ ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ হল এটি পূর্ববর্তী শষ্যবীজের সব গুনাবলী নিজের মধ্যে ধারণ করল অর্থাৎ এর মাঝে সমস্ত গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে গেছে। এরই ভিত্তিতে স্বর্ণকেও **'আহবাব'** বলে থাকে। কেন না যে অন্যের দ্বারা পূর্ণ হবে সে নিজ অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলবে অর্থাৎ সে ঘুমিয়ে পরবে এবং তার অস্তিত্বের কোন অনুভূতিই অবশিষ্ট থাকবে না।

সুতরাং এক আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মু'মিনের প্রকৃত ভালবাসা এই দাবি রাখে, সে যেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সব কিছুকে উৎসর্গ করার চেষ্টায় রত থাকে। এরপর সব শক্তির অধিকারী পরম শক্তিশালী খোদা তার জন্য কি করেন সে তা দেখতে পাবে।

সূরা হজ্জের ৪১নং আয়াতে শক্তিশালী কাফেরদের মোকাবেলায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শক্তিশালী হওয়ার কথা বলে মু'মিনদের শান্তনা দিয়েছেন। এখন যেহেতু চরম নির্যাতন হচ্ছে তাই দুর্বল ও সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও এবং সামগ্রীর অপ্রতুলতা ও তোমাদের নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারা যে শুধু শিরকের চরম সীমায় পৌঁছেছে তা নয় বরং তারা চরম মাত্রায় নির্যাতন চালাচ্ছে। এখন ধর্মের অস্তিত্বের প্রশ্ন। নতুবা যুলুম বেড়েই যাবে। পৌত্তলিকেরা কোন ধর্মকে সহ্য করবে না এবং তারা তাদেরকে নির্যাতন করার লক্ষ্যস্থল বানাবে। যেভাবে তিনি বলেছেন-

إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

(সূরা হজ্জ : ৪১ আয়াত)

অর্থাৎ সে সব লোক যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধুমাত্র এই কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা বলে আল্লাহ আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক। যদি আল্লাহ্ তাআলা মানুষের একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে সাধু সন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিকহারে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

সুতরাং শান্তি বজায় রাখার জন্য নির্যাতনের প্রতি-উত্তর কঠোরভাবে প্রদানের অনুমতি আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। (অর্থাৎ) তোমরা এরূপ করলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য সহযোগীতা তোমাদের সপক্ষে থাকবে।

অতএব এখানে নীতিগত বিষয় বলে দেয়া হয়েছে যে ধর্মীয় যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলে অবশ্যই তা প্রতিহত করতে হবে। শুধু নিজের ধর্মকেই নয় বরং অন্যান্য ধর্মগুলোকেও রক্ষা করতে হবে। কেননা মুসলমানদের দাবী, কোন ধর্মের অনুসারীদের আমরা বাহুবলে ধর্মান্তরিত করবো না। কারণ এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আর এ বিষয়টি জগতের শান্তি বিনষ্টকারী।

হেদায়াত দেয়া বা না দেয়াটা খোদা তাআলা নিজের কর্তৃত্বে রেখেছেন। হ্যাঁ, ভালবাসা, বিভিন্ন পন্থা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তবলীগ করার দায়িত্ব একজন মুসলমানকে পালন করা উচিত এবং এটা আবশ্যকীয়।

তৃতীয় বিষয় হলো- আল্লাহ তাআলা ধর্মীয় যুদ্ধে নির্যাতিত ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিতদের অবশ্যই সাহায্য করেন। মহানবী (সা.) এর যুগে যে যুলুম-নির্যাতন হচ্ছিল তা সীমাতিরিক্ত নির্যাতন ছিল। মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের দুর্দশা প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছিল। হিজরতের পর ধর্মীয় যুদ্ধ যদি কারো সাথে করা হয়ে থাকে তবে সেটা মুসলমানদের সাথে করা হচ্ছিল।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজ অঙ্গীকারানুসারে নিজের পরম শক্তিশালী ও মহা পরাক্রমশালী হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। উপকরণের অপ্রতুলতা ও অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো তখন তিনি তাদের সাহায্যও করেছেন এবং মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফিরিশতাদের পাঠিয়েছেন।

সুতরাং এ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র আত্মরক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। ধর্মের ওপর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ) করাই হল প্রকৃত জিহাদ। অন্যান্য যেসব যুদ্ধ হয়ে থাকে তা এক মুসলিম দেশের সাথে অন্য মুসলিম দেশের হোক, অথবা অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের হোক, সেটা হল রাজনৈতিক ও জাতিগত যুদ্ধ। বর্তমানে যেসব যুদ্ধ হচ্ছে এগুলো রাজনৈতিক ও জাতিগত যুদ্ধ। এগুলো জিহাদ নয়। আল্লাহ তাআলা পুনরায় নিজের পরম শক্তিশালী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন- ধর্মের ওপর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমি ধার্মীকদের সাহায্য করবো। যেহেতু আল্লাহ তাআলার ঘোষণানুসারে শেষ ও পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলাম তাই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সাহায্যের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আর **ইন্নাল্লাহা কাবিউন আযীয** অর্থাৎ 'আল্লাহ তাআলা অতিশয় শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনকারী' বলে এ কথার ঘোষণা দিয়েছেন- মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ হলে আমি তাদের সাহায্য করবো। সুতরাং বর্তমানে যেসব আক্রমন চালানো হচ্ছে, বিশৃংখলা ও যুদ্ধ হচ্ছে সেগুলোতে বিজয়ের পরিবর্তে মুসলমানরা পরাজয়ের সম্মূখিন হচ্ছে, তা যে জিহাদ নয় এবং আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে ধর্মীয় যুদ্ধও নয় এরই জ্বলন্ত প্রমাণ এসব। এ কারণেই তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্যও লাভ করে না। সুতরাং মুসলমানদেরকে ধর্মের জন্য অস্ত্র ও কামান ধারনের পরিবর্তে নিজের ঈমান ও কর্মের সংশোধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলার সমীপে বিনত হয়ে নিজেদের সংশোধনের জন্য কান্নাকাটি করা উচিত। তখন মুসলমানরা কামান ও বন্দুক ছাড়াই জগৎকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের প্রতি এটাও নির্দেশ রয়েছে, 'কোন ধর্মের ওপর আক্রমণ করার অথবা বল প্রয়োগ করার অনুমতি তোমাদেরকে কখনো দেয়া হয়নি।'

সুতরাং বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষাই কুরআন করীমের শিক্ষার সঠিক ব্যাখ্যা দেয় এবং তা সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। এ অনুসারে কাজ করুন আর দেখুন পরম পরাক্রমশালী খোদা কিভাবে নিজের শক্তি ও প্রতাপ প্রকাশ করেন এবং কী কী দৃশ্য দেখান।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইসলামের প্রাথমিক যুগের, মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের প্রেক্ষিতে জিহাদের অনুমতি প্রদান এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভের চিত্র এক স্থানে বর্ণনা করেছেন, তা আমি তুলে ধরছি। তিনি (আ.) বলেন- যেহেতু ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা সংখ্যায় অল্প ছিল। এ জন্য তাদের বিরোধীরা অহংকারবশত যা প্রকৃতিগতভাবে এমন লোকদের মন ও মস্তিস্কে বিদ্যমান থাকে- নিজেদেরকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, সংখ্যাধিক্য, মানসম্মান এবং আভিজাত্যে অন্যান্য দল থেকে উত্তম মনে করত। তারা সে সময়ের মুসলমান অর্থাৎ সাহাবাদের সাথে চরম শত্রুতা করেছে। তারা এটা চাইতো না, এই ঐশী বৃক্ষের চারা পৃথিবীতে রোপিত হোক। বরং তারা ঐ হেদায়েত প্রাপ্তদের ধ্বংস করার জন্য নিজেরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। আর দুঃখ-কষ্ট দেয়ার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করেনি। তাদের ভয় ছিল – এই ধর্মের ভিত যেন দৃঢ় না হয়ে যায় এবং এ ধর্মের উন্নতি আমাদের জাতিসত্তা ও ধর্মের ধ্বংসের কারণ না হয়ে যায়।

সুতরাং এই ভয় যা তাদের হৃদয়ে এক আতঙ্করূপে বিরাজমান ছিল এ কারণে অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুর কর্মকান্ড তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং নির্মমভাবে অনেক মুসলমানকে তারা হত্যা করেছে। তের বছর ব্যাপ্তি এক দীর্ঘ যুগ ব্যাপী তাদের পক্ষ থেকে এ কাজই করা হচ্ছিল। খোদার নিষ্ঠাবান এবং মানব জাতির গৌরব এই বান্দাগণ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে সেইসব নিকৃষ্ট জন্তুদের তরবারি দ্বারা টুকরো টুকরো হয়েছে। এতীম ছেলে-মেয়ে এবং বিনয়ী ও দূর্বল মহিলাদেরকে অলিগলিতে জবাই করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেও খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নিশ্চিতরূপে এ

নির্দেশ ছিল, দুষ্টের সাথে লড়াই করো না। সুতরাং ঐ নিষ্ঠাবান পুন্যাত্মারা এমনই করেছেন। তাদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু তারা টু শব্দটি করেন নি। তাদেরকে কুরবানীর (পশুর) মত জবাই করা হয়েছে, কিন্তু তারা উফ্ করেন নি।

খোদার পুত-পবিত্র রাসূল যাঁর ওপর আকাশ ও পৃথিবী থেকে অগনিত সালাম বর্ষিত হয়, তাঁকে পাথর মেরে অসংখ্যবার রক্তাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সততা ও অবিচলতার এই পাহাড়, এ সব নির্যাতন প্রশস্ত চিত্তে এবং হাস্যবদনে সহ্য করেছেন। তাঁর ধৈর্য্যশীলতা ও উদারতার ফলে বিরুদ্ধবাদীদের দুঃসাহসিকতা দিন দিন বৃদ্ধি পেল এবং এই পবিত্র জামা'তকে তারা নিজের এক শিকার মনে করে নিল। তখন ঐ খোদা যিনি চান না পৃথিবীতে জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা সীমা অতিক্রম করুক, তিনি নিজের নির্যাতিত বান্দাদের স্মরণ করলেন এবং তাঁর ক্রোধ ঐ হীন-নিকৃষ্টদের ওপর প্রজ্জ্বলিত হল।

তিনি তাঁর নির্যাতিত বান্দাদেরকে তাঁর পবিত্র বাণী কুরআন শরীফের মাধ্যমে জানালেন, তোমাদের সাথে যেসব আচরণ করা হচ্ছে, আমি সবই দেখছি। আমি আজ থেকে তোমাদের প্রতিহত করার অনুমতি দিচ্ছি। সর্বশক্তিমান খোদা, যালেমদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না। এ নির্দেশকে অপর ভাষায় নামকরণ করা হয়েছে জিহাদ। এ আদেশ সম্বলিত মূল উদ্ধৃতিটি এখনো কুরআন করীমে এভাবে বর্তমান রয়েছে **"উযেনা লিল্লাযিনা ইউক্বাতালুনা বেআন্নাহুম যুলেমু ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরেহীম লাক্বাদীর, আল্লাযীনা ইউখরেজুনা মিন দিয়ারিহিম বেগায়রে হাক্ব"** অর্থাৎ যাদের অন্যায় ভাবে হত্যা করা হচ্ছে এবং নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। (আল্লাহ তাআলা) তাদের আকুতি শুনেছেন ও তাদেরকে (তাদের শত্রুর) মোকাবেলা করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা নির্যাতিতদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু এ আদেশ নির্দিষ্ট যুগ ও সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল, সর্বকালের জন্য নয়। সেই যুগ ও সময়ের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিল, যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের ছাগল ভেড়ার ন্যায় জবাই করা হত। সুতরাং

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা দেখে একথা বলা যায় না যে, মুসলমানরা খুব জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় আছে

আল্লাহ তাআলা যিনি সব ক্ষমতাবানদের চাইতে অধিক ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী। নির্যাতিতদের স্বপক্ষে তার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হল। পৃথিবীবাসীরা জানে, মক্কায় যাদের আগুনের ওপর শোয়ানো হত, নগ্ন পিঠে চাবুক মারা হত এবং দেহ চিড়ে ফেলা হত সে সব নির্যাতিতরা সেই শক্তিশালী খোদা তাআলার সাহায্য ও সহযোগীতায় শুধু নির্যাতন থেকেই রক্ষা পায়নি বরং তাদেরকে **কায়সার** (রোম) ও **কিসরার** (পারস্য) রাজত্বের মালিক বানানো হল। এ হচ্ছে শক্তিশালী খোদা তাআলার মাহাত্ম্য।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, আল্লাহ তাআলা তাঁর শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন এবং প্রায় সব আয়াতেই আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর নবীগণের শত্রুদের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন বা কিছু উপদেশ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দুটি আয়াত আমি পাঠ করেছি। তিনি এতে ভবিষ্যতের জন্যও সুসংবাদ দিয়েছেন যে পরবর্তীতেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) বিজয়ী হবেন।

যেমন সূরা মুজাদেলাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **"কাতাবাল্লাহু লা আগলেবান্না আনা ওয়া রুসূলী ইন্নাল্লাহা কাবিউন আযীয"** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারিত করে রেখেছেন, নিশ্চয় আমি ও আমার রাসূল বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা প্রবল শক্তিধর ও মহা পরাক্রমশালী।

সত্য সর্বদা বিজয়ী হয়, এটা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত। সকল নবীদের বিরুদ্ধাচারণকারীরা মন্দ পরিনামের শিকার হয়েছে। মুসলমানগণ যতদিন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এর ওপর আমল করেছে ততদিন সফলতা তাদের পদ চুম্বন করেছে। কিন্তু ধর্ম ও ইসলামের কিছুই যখন অবশিষ্ট রইল না, তখন তারা সবাই নিজ নিজ রাজত্ব রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে গেল, ছোট ছোট যে কয়েকটি রাজত্ব রয়েছে কমপক্ষে সেগুলো যেন রক্ষা পায়।

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা দেখে একথা বলা যায় না যে, মুসলমানরা খুব জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় আছে। অন্যরা তদের এ জাঁকজমকের জন্য তাদের দিকে লোলূপ দৃষ্টিতে তাকায় অথবা অন্যান্য দেশ তাদের এ প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য তাদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। তবে একথা সত্য যে, কয়েকটি দেশের তেল সম্পদের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি রয়েছে এবং তারা সেই সম্পদের দিকে (লোভাতুর দৃষ্টিতে) তাঁকিয়ে আছে। সম্পদশালী মুসলিম দেশসমূহও তাদের স্থায়ীত্বের জন্য অমুসলিমদের মুখাপেক্ষী। এখন বাস্তবিক অর্থে মুসলমানদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই এবং উন্নতির কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, যারা ইসলামকে ভালবাসে (মুসলমানদের)

অধঃপতন ও লাঞ্ছণার দৃশ্য তাদের চোখে পরে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিজয়ী হওয়ার অঙ্গীকার কি (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে অথবা এ বিজয়ের অঙ্গীকারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েগেছে, এটি কি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল নাকি আল্লাহ তাআলার 'পরম শক্তিশালী' গুণের মাঝে কোন কমতি দেখা দিল? যাবতীয় এ সব আশঙ্কার কথা সবই-ভুল।

আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার সত্য। এ ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য যে, ইসলাম ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ীত্ব লাভ করবে এবং উন্নতি করবে। আল্লাহ তাআলার অন্য সব গুণের ন্যায় তাঁর মহাশক্তিশালী হওয়ার গুণও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সর্বদা থাকবে। এ বিজয়ী ও শক্তিশালী হওয়া বিষয়ক গুণের প্রমাণের জন্যই বর্তমান যুগের ইমামকে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপরও এ ইলহাম করেছেন, **"কাতাবাল্লাহু লা আগলেবান্না আনা ওয়া রুসুলী"** অতএব, পৃথিবীতে পুনরায় ইসলাম ধর্মের আলো ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীতে এ ধর্ম সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তাআলা বেশ কয়েকবার ইলহামের মাধ্যমে এ বিষয়টি অবগত করেছেন যে, তিনি (আ.) শক্তিশালী হবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য সমর্থন করবেন। আল্লাহ তাআলা এক স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে সম্বোধন করে বলেছেন, **"কুয়্যাতুর রাহমানে লেউবায়দিল্লাহিস্ সামাদ"** অর্থাৎ এটি আল্লাহ্ তাআলার শক্তি যা তাঁর বান্দার জন্য অমুখাপেক্ষিতা ও শক্তিমত্তার বর্হিপ্রকাশ ঘটাবেন। এর পর বলেন **'ইন্নাহু কাবিয়ূন আযিয'**-অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি মহা শক্তিধর এবং বিজয়ী। আরেক স্থলে বলেন- **'ইন্না রাব্বী কাবিয়ূন কাদির, ইন্নাহু কাবিয়ূন আযিয'**-অর্থাৎ আমার প্রভূ-প্রতিপালক অসাধারণ শক্তির অধিকরী এবং তিনি পরম শক্তিশালী ও বিজয়ী।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর একটি ইলহাম, 'আমি আমার অলৌকিকতা প্রদর্শন করব। আমি আমার শক্তির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে তোমাকে উন্নীত করব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে কিন্তু পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহা প্রতাপশালী আক্রমনের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন।

'আল ফিতনাতু হাহুনা ফাসবির কামা সাবারা উলুল আজম।' অর্থাৎ এখানে একটি বিশৃঙ্খলা রয়েছে, তাই তুমি দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীদের ন্যায় ধৈর্য্যধারণ কর। **ফালাম্মা তাজাল্লা রাব্বুহু লিল জাবালে যায়ালাহু দাক্কা** অর্থাৎ আল্লাহ যখন বিপদের পাহাড়ে জ্যোতির বিকাশ করবেন তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন। **কুওয়াতুর রহমানে লা উবায়দিল্লাহিস সামাদ** অর্থাৎ এটি আল্লাহ্ তাআলার শক্তি যা তাঁর বান্দার জন্য অমুখাপেক্ষিতা ও শক্তিমত্তার বহির্প্রকাশ ঘটাবেন। **মুকামুন লা তাতারাক্কাল আবদু ফিহে বিসায়িল আমাল** অর্থাৎ আব্দুল্লাহিস্ সামাদ (সামাদ আল্লাহর বান্দা) একটি মর্যাদার নাম যা বিশেষ ভালবাসার সাথে দান করা হয়। এটি চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত করা যায় না।

আল্লাহ্ তাআলার এ মর্যাদা (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তাআলার অমুখাপেক্ষী বান্দা হওয়ার এ মর্যাদা লাভ করা আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ দান। বান্দা আল্লাহ্ তাআলার দিকে ধাবিত হলেই বিশেষ এই দানপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এ দান আল্লাহ্ তাআলারই দান, এ পুরষ্কার আল্লাহ্ তাআলারই পুরষ্কার যা চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। যাই হোক এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাথে বান্দার এক বিশেষ সম্পর্ক প্রকাশিত হয় যার জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে দান করে থাকেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, মহা প্রতাপের অধিকারী আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে তিনি কতক নেতা এবং কতক দেশকে আমাদের দলে অন্তর্ভূক্ত করবেন এবং তিনি আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে কল্যনের পর কল্যাণ দান করব এমনকি বাদশাহ তোমার পোষাক থেকে কল্যাণ অন্বেষন করবে।

তিনি (আ.) বলেছেন, এ কল্যাণ অন্বেষণকারীরা বয়আত গ্রহণ করবে। এমনকি তাদের বয়আত করার কারণে সেই জাতির রাজত্বও (এর আওতাভূক্ত) হবে অর্থাৎ বাদশাহ যখন দীক্ষা নিবে তখন সে জাতিও এতে প্রবেশ করবে। এর পর কাশফী অবস্থায় আমাকে সে বাদশাহদের দেখানো হয়েছে, তারা ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছয়-সাত জনের কম হবে না। সুতরাং এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় বরং এটি সেই খোদার প্রতিশ্রুতি যিনি শক্তিশালী এবং ক্ষমতাধর। যিনি সর্বদা নিজ নবীদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। আজও (আমরা তাঁর) অগণিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখেছি এবং দেখছি। কোন কোন দেশ, বিশেষ করে ইসলামী দেশগুলোতে এবং আমাদের নিজ দেশ পাকিস্তানেও আমাদের নির্যাতিত অবস্থা রয়েছে তা দেখে পৃথিবীর লোকেরা মনে করবে এ সব লোক যে সব কথা বলে তা কোন পাগলের প্রলাপ।

পৃথিবীর মানুষ সর্বদা এটিই মনে করেছে এবং খোদা তাআলার নিয়তি সর্বদা বিজয় লাভ করেছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, এটি খোদা তাআলার সুন্নত, যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে সর্বদাই তিনি এ সুন্নত প্রকাশ করতে থেকেছেন যে তিনি নিজ নবী এবং রাসূলদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তাদেরকে বিজয় দান করেন। যেভাবে তিনি বলেছেন **'কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলী'** বিজয়ের অর্থ হল, নবী এবং রাসূলগণ যেভাবে আকাঙ্খা করেন, পৃথিবীতে যেন খোদার (হুজ্জত) অকাট্য দলিলের পূর্ণতা পায় এবং কেউ যেন তাঁর মোকাবেলা করতে না পারে।

এভাবে আল্লাহ্ তাআলা শক্তিশালী নিদর্শনের সাথে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করে দেন। এ বিজয়ের অর্থ হল

পৃথিবীতে যেন 'সত্য' প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, কেউ যেন এর সামনে দলিল দিতে না পারে এবং এ বাণী যেন পৌঁছে যায়। পৃথিবীতে তারা যে নেকী ছড়িয়ে দিতে চান তাদের হাতেই এর বীজ বপন করান। অর্থাৎ নবীগণ যে সত্য নিয়ে আগমন করেন এর বীজ নবীদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। কিন্তু তাদের হাতে এর পূর্ণতা দেন না বরং এমন মূহূর্তে তিনি তাদের মৃত্যু দেন যখন বাহ্যত এক অসফলতার ভয় থাকে এবং বিরোধীদের হাসি-ঠাট্টা, উপহাস ও বিদ্রুপের সূযোগ দেন। তারা যখন হাসি-ঠাট্টা করে ফেলে তখন তিনি তাঁর শক্তির অপর হাত প্রদর্শন করেন এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যার মাধ্যমে অপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণতা পায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) 'আল ওসিয়্যত পুস্তকে' এ কথাগুলি উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক, তাঁর সাথে ভালবাসা, তাঁর রাসূল (সা.) এর সাথে ভালবাসা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার সংরক্ষণের ওপর এ দ্বিতীয় কুদরতের যুগে কত দ্রুত আমরা এ বিজয় প্রত্যক্ষ করব তা নির্ভর করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন **মান কানা লিল্লাহে কানাল্লাহু লাহু** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা কোন সত্যবাদীর সাথে অবিশ্বস্ততা করেন না। যদি সারা পৃথিবীর মানুষও তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁর সাথে শত্রুতা করে তবু তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। খোদা তাআলা অতীব ক্ষমতাবান এবং শক্তিশালী।

মানুষ ঈমানের শক্তি বলে তাঁর সুরক্ষার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তাঁর কুদরত এবং শক্তির মহিমা দেখে থাকে এর পর সে আর লজ্জিত হবে না। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমতাবানের ওপরও ক্ষমতাবান, এমনকি তিনি তাঁর সব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। সত্যিকার নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে নামায পড়, দোয়াতে লেগে থাক, নিজের সব আত্মিয়-স্বজন এবং প্রিয়জনদের এ শিক্ষাই দাও। খোদার প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হলে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ক্ষতির মূল হল গুনাহ।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত হই। সব গুনাহ থেকে যেন বেঁচে থাকি। প্রত্যেক আহমদী যেন তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার আগুন এত অধিকহারে প্রজ্জ্বলিত করে যার ফলে সমস্ত দূষণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমরা যেন পৃথিবীকে সে দৃশ্য দেখাই যা দেখানোর আশা ও আকাঙ্খা আমাদের হৃদয়ে রয়েছে। আল্লাহ্ এমনি করুন। আমীন।

[জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত]

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)এর পক্ষ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা

হুযূর (আই.) গত ০১/০১/২০১০ তারিখের জুমুআর খুতবার শুরুতেই বিশ্ববাসীকে নতুন বছরের অভিনন্দন জানান, তিনি বলেন-

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আজ ২০১০ইং সালের প্রথম দিন আর আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে জুমুআর দিনের মাধ্যমে এই প্রথম দিনে প্রবেশ করিয়েছেন, যেটি দিনগুলোর মধ্যে কল্যাণমন্ডিত দিন। তাই আমি সর্ব প্রথম আপনাদের সবাইকে নতুন বছরের অভিন্দন জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ তাআলা সকল আহমদীর জন্য এ বছর এবং আগত প্রতিটি বছরকে সব দিক থেকে কল্যাণ মন্ডিত করতে থাকুন। প্রতি বছর আমরা একে অপরকে নতুন বছরের অভিন্দন জানিয়ে থাকি। কিন্তু একজন মু'মিনের জন্য কোন বছর বা দিন তখন কল্যাণ মন্ডিত হয় যখন তা তার জন্য তওবা কবুলের কারণ হয়, তার আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয় এবং তার জন্য ক্ষমার(তওবা কবুল) কারণ হয়।

.... আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বদা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ দান করতে থাকুন। ইহকাল এবং পরকালের সকল ধরনের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। নেকির সাথে চলার সৌভাগ্য দান করুন। এ বছর ও আগামী বছরগুলো যেন জামা'তের সদস্যদের জন্য সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দায়ী হয় এবং সকল প্রকার কল্যাণ নিয়ে যেন শুভাগমন করে। আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ তাআলার সেই নূর থেকে সর্বদা অংশ লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাথে নিয়ে জগতে আগমন করেছেন। (আমীন)

নেযামে নও
(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা

(১০ম কিস্তি)

চতুর্থ নির্দেশনা যাকাত ও সাদক্বা আদায়

এখন প্রশ্ন উঠে, ইসলাম কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে টাকা কড়ি অবশ্যই রয়ে যেতে দেয় না বরং তা ছড়িয়ে দেয় উপরন্তু টাকা কড়ি জমিয়ে স্থবির করে ফেলে রাখতেও নিষেধ করে, তথাপি দারিদ্রের প্রতিকার তো হচ্ছে না।

এর জবাব হলো, ইসলাম দরিদ্রদের অধিকার সংরক্ষণে চতুর্থ এক আদেশ সাদক্বা ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।

অর্থাৎ সোনা ও রূপার নির্ধারিত পরিমাণ (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য) অথবা তৎপরিমাণ মূল্যমানের সম্পদ বা ব্যবসায়িক পণ্য যদি কোন ব্যক্তির অধিকারভুক্ত অবস্থায় অব্যবহৃত থেকে যায় এবং এই অবস্থায় এক বছর কেটে যায়, তবে জরুরী হলো রাষ্ট্র তার থেকে বছরে শতকরা আড়াইভাগ হারে **'কর'** আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করবে আর এভাবে সংগৃহীত **'কর'**এর অর্থ গরীবদের জন্য ব্যয় করবে। এই **'কর'** কে **যাকাত** বলা হয়। এ **'কর'** শুধু আয়ের ওপর নয় বরং, পণ্য ও মুনাফা সব কিছু মিলিয়ে তার ওপর নির্ধারণ করা হয়। আর এতে করে আড়াই শতাংশ কখনও লভ্যাংশের পঞ্চাশ শতাংশ-তে গিয়ে পৌঁছায় আবার কখনও বা এর চেয়েও বেশী। এ নির্দেশনা অনুযায়ী যার কাছে শত টাকা জমা থাকবে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে অবশ্যই আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে। ফলে, তার বিশেষ চিন্তা থাকবে যে বছর ঘুরে এলে এই পরিমাণ টাকা যদি জমা থাকতেই থাকে তবে কিছু দিনের মধ্যেই সব টাকা **'কর'** আদায়েই খরচ হয়ে যাবে। অতএব, সে দ্রুত তার সেই টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে যাতে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। আর টাকা যখন সে ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে তখন সে টাকা হস্তান্তরিত হতে থাকবে। এভাবে গরীবদের প্রাপ্তিতে তার সেই টাকার শতকরা আড়াই ভাগ যোগ হওয়া ছাড়াও বিনিয়োগহীন স্থবির অর্থ Idle Money থাকাতে যে ক্ষতি হতে পারতো তা থেকে রাষ্ট্র ও জাতি রক্ষা পাবে। ইদানিং লোকদের মাঝে বিশেষ রকমের এ মন্দ রীতি দেখা যাচ্ছে যে, তারা সোনা-রূপা জমা করে রেখে দিচ্ছে। গরীবদের বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন পড়ে আর তারা এটাও জানে যে স্বর্ণের মূল্য ইদানিং বেড়ে গেছে। তারা নিজেদের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে এ উপায়টিই ভেবে নেয় যে, অলঙ্কারাদি বিক্রি করে সমস্যাদি কাটিয়ে উঠবে। এভাবে কেউ (হাতের) আংটি বেচে দেয়, কেউবা বিক্রি করে কানের দুল, কেউ বেচে গলার হার আবার কেউবা বিক্রি করে পায়ের নূপুর। কিন্তু জানো কী, এসব সোনা রূপা কোথায় জমা হচ্ছে? এ সব যাচ্ছে সুদখোর বেনীয়াদের ঘরে। আবার কেউ কেউ এই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে সোনারূপা জমা করছে যে, জাপান এ দেশ দখল করে নিলে কাগজের টাকার নোট তো অচল হয়ে পড়বে। তারা এটা জানে না যে, জাপান দখল করতে পারলে তারা সবার আগে সোনা-রূপাই লুট করবে। তারা অবশ্য ভেবেছে যে সোনা তো তাদের নিজেদের ঘরেই রয়ে যাবে। আর যার কাছে টাকার নোট থাকবে সে নিজের জন্য কিছুই ধরে রাখতে পারবে না।

এ কারণে প্রতি নিয়ত স্বর্ণের মূল্য বেড়েই চলছে। চল্লিশ টাকা থেকে তা বাড়তে শুরু করে এখন সত্তুর টাকায় গিয়ে ঠেকেছে আর ব্যবসায়ীদের থেকে আমি শুনেছি তারা বলে থাকে, 'আমাদেরকে স্বর্ণের মূল্য বাড়িয়ে শত টাকায় নিয়ে যেতে হবে'। কিন্তু ইসলাম বলে, প্রথম কথা তোমরা টাকা জমিয়ে রেখো না, আর যদি জমিয়ে রাখো তবে এর ওপর শতকরা আড়াই হারে আমাদেরকে **'কর'** দাও। এভাবে জমাকৃত টাকা ইসলাম দেশবাসী গরীবদের মাঝে পূণরায় ফেরত নিয়ে আসে যাতে তারা এথেকে উপকৃত হতে পারে। আর লোকেরা যাতে অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থ প্রবাহ চালু রাখে এ জন্য ইসলাম বাধ্য বাধকতা আরোপ করে। ইসলামের নির্দেশনার ওপর আমল করতে থাকলে কৃপণ থেকে কৃপণতর ব্যক্তির অর্থ সম্পদ থেকেও বিশ্ব মঙ্গল লাভ করতে শুরু করবে আর এভাবে দরিদ্রদের কর্মের সংস্থান হয়ে যাবে সেই সাথে শতকরা আড়াই টাকা পৃথকভাবে কাজে লাগানোও সম্ভব হবে।

ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা স্বত্ত্ব সংরক্ষিত

তবে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলাম সম্পদের ওপর সবার হক্ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ত্বকে বাতিল করেনি বরং তা সংরক্ষণ করেছে। অবশ্য ব্যক্তি মালিকানার স্বত্ত্বাধিকারী তার নিজ সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের ন্যায় হবে, আর এ ছাড়াও স্বত্ত্বাধীকারী হিসেবে তার যে ক্ষমতা রয়েছে, ইসলাম বিভিন্ন উপযোগী পদক্ষেপ দ্বারা তা দুর্বল করে দিয়েছে,

যেমনটা এতক্ষণের আলোচ্য নির্দেশাবলী থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

বলশেভিক ব্যবস্থাপনার চেয়ে ইসলামী ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ সমূহ

এক্ষেত্রে এ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, ইসলামের এ ব্যবস্থাপনার চেয়ে বলশেভিক ব্যবস্থাপনাকে তবে কেন অধিকতর উপযুক্ত জ্ঞান করা হবে না? এর উত্তর হলো-ব্যবস্থাপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচেছ শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা আর জাতীর অগ্রগতির ধারাকে সমুন্নত রাখা। কিন্তু বলশেভিক আন্দোলন বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার মধ্যে অকস্মাৎ এমন পরিবর্তন ঘটায় যা দেশের শক্তিশালী এক অংশের অপুরনীয় ও অসহনীয় ক্ষতি সাধন করে। এতে করে রাষ্ট্রের সেই অংশ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে আর সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যেমন-একথা বলা যে প্রত্যেক বিত্তশালী ব্যক্তির বাড়ী-ঘর দখল করে ফেলো, তার সম্পত্তি তার থেকে ছিনিয়ে নাও, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করো, এসব কর্ম মানুষকে এতো বেশী দু:খ দেয় যা তার জন্য অসহনীয় এক যাতনা। তাই রাশিয়ার সবচেয়ে বেশী বিরোধীতা করছে স্বয়ং রাশিয়াবাসীরাই। আর এমন রাশিয়ানরা এখন প্রত্যেক দেশে ছড়িয়েও পড়েছে যারা রাশিয়ার ওই ব্যবস্থাপনা (বলশেভিক)-এর ঘোর বিরোধী। আমি নিজে ইউরোপ সফর কালে এমন রাশিয়ানদের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা রাশিয়া সরকারের **'জান-ই-দুশমন'** এ (চিরশত্রুতে) পরিণত হয়েছে। এর কারণ এটাই যে তারা নিজ গৃহে নিরাপদে বসবাস করে যাচ্ছিল এ অবস্থায় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের লোকজনেরা এলো আর-সেসব লোকেরা বাড়ীর মালিকদের মালপত্র, খাট-পালঙ্ক কেড়ে নিয়ে তাদেরকে নিজেদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দিল, তাদের সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলো আর তাদেরই সম্পত্তি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করলো। এটা স্বীকার করে নিচ্ছি, তারা যা কিছু উপার্জন করেছে তাতে অন্যেরও হক্ ছিল কিন্তু বংশ পরম্পরায় তারা এধারণা পোষণ করায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, 'এ সব কিছুর মালিক আমরাই' এজন্য জোরপূর্বক যখন ওই সব ধন সম্পদ ও জমিজমা এবং আসবাপত্র করায়ত্ত করে নেয়া হলো তখন স্বভাবত:ই সেটা তাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। এ কারনেই রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, শাসন ব্যবস্থা পূর্ব থেকে যা চলে আসছে আমরা তা ভাঙ্গবো না অর্থাৎ তাদের সাথে এমন আচার আচরণ করবো না যাতে তাদের মনে হতে পারে যে 'আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে'।

দ্বিতীয়ত মেধাও মূল্যবান এক সম্পদ-পূঁজি বিশেষ, কিন্তু বলশেভিজম এর বলশেভিক ব্যবস্থাপনা এ বিষয়টির অবমূল্যায়ন করেছে যে অর্থ কড়ি যেমন মূলধন, মানুষের বুদ্ধি ও মেধাও তেমনি মূলধন। আর এই মূলধনকে তারা বন্টনই বা কীভাবে করতে সক্ষম হবে! এতে করে তাদের এই ব্যবস্থা তো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের গতিধারাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করে ছাড়ে। কেননা তারা বিচক্ষণতাকে এতটা মূল্যবান মনেই করে না যতটা মূল্যমান তারা নির্ধারণ করে নিয়েছে স্বহস্তে কাজ করাকে। আর এটা এক স্বাভাবিক নিয়ম যে, দেশে যে জিনিসের চাহিদা না থাকে তার দরে পতন ঘটতে শুরু করে। যে লোকদের দৃষ্টিতে টাকা কড়ির কোনই মূল্য নেই তাদের টাকা পয়সা বিনষ্ট হয়, আবার যাদের কাছে জমি জমা মূল্যহীন তাদের সম্পত্তি নষ্টই হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, যে লোকদের দৃষ্টিতে মেধার কোনই মূল্য নেই তাদের বুদ্ধি নিম্নগামী হতে শুরু করে। অতএব, বলশেভিক ব্যবস্থাপনার এটা এক মস্তবড় ত্রুটি যে তারা অর্থ কড়িকে তো পূঁজি জ্ঞান করে কিন্তু বুদ্ধিকে মূলধন রূপে নির্ধারণ করে না, কেননা তারা অর্থ কড়ি বন্টন করতে পারলেও বুদ্ধি ও মেধা তো আর বেটে দিতে পারে না। এজন্য তাদের নীতিতে বুদ্ধি মূল্যহীনই থেকে যায় আর এ কারণে একদিন তাদের অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ে এর অগ্রগতির ধারায় ঘাটতি দেখা দেবে। কিন্তু ইসলামের প্রতিটি পদক্ষেপ ধাপে ধাপে উন্নীত হয়। ইসলাম অকস্মাৎ কোন বিপ্লব সংঘটিত করে না বরং প্রেম ভালবাসার সাথে, মমতার সাথে প্রত্যেক প্রকারের পূঁজি মানব কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দেয় আর এভাবে মেধা, বুদ্ধি ও টাকা পয়সা সবই বেটে দিতে বলে। প্রাকৃতিক বিধানও বলশেভিক নীতি বিরুদ্ধ, কেননা মেধাশক্তি বা বিচক্ষণতা ব্যক্তি বিশেষকে প্রকৃতিগত ভাবেই যেমন বেশী দেয়া হয় তেমনি আবার কাউকে দেয়া হয় কম। কিন্তু এর পরও এভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠিত রাখা হয় যে, যার মেধা লাভ হয়েছে তাকে ধর্ম নির্দেশ করে, সে নিজ মেধাকে মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত করুক। যেমন কুরআন করীম নির্দেশ করেছে

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

(বাক্বারা-৪)

ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউন ফেক্বুন অর্থাৎ মু'মিন ও প্রকৃত খোদাভীরু সে-ই, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু তার প্রাপ্তি ঘটেছে, হোক তা মেধাশক্তি বা দৈহিক শক্তি, অর্থকড়ি বা বুদ্ধি বিবেচনা তা অপরের তথা অন্য সৃষ্ট জীবদের সেবায় ব্যয় করে। একইভাবে ধন সম্পদের বেলায় ইসলাম এটাই নির্ধারণ করে যে তা যেন বন্টন করে দেয়া হয়। তবে বলশেভিক ব্যবস্থাপনার ন্যায় জোর জবরদস্তি করে নয় বরং তাদেরই স্বহস্তে যারা নিজেরা সেই ধন-সম্পদের মালিক। আর সেইভাবেই বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী যারা তাদেরকেও ইসলাম স্বপ্রনোদনায় নিজ বুদ্ধি দ্বারা মঙ্গল-সাধনের জন্য নির্দেশ দেয়।

এভাবে কল্যাণ যেমন সাধিত হয় তেমনি মানব অন্তরে শত্রুতার বীজও বপিত হয় না।

বলশেভিজমে অন্যায় রীতি-নীতির আচার অনুষ্ঠান পালিত

আমি আবারও বলছি যে, বলশেভিজম এখনও ন্যায়নুগ আচরণ ও সমতা বিধান করতে পারছে না। তাদের মাঝে এখনও বড় ছোট এর ব্যবধান রয়ে গেছে। এখনও তাদের ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য আছেই। আর এখনও তাদের খাবারের মানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেউ কী বলতে পারে যে, ষ্ট্যালিনের আর সেখানকার এক গ্রামবাসীর খাবার ম্যেনু হুবহু এক। তদ্রুপ রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণের ভোজ সভায় বেহিসাবী খরচ করা হয়ে থাকে। ইদানিং মি. উইনটল বিল্কী সেদেশে গিয়েছিলেন। সে উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় ভোজের এক বিবরণ ছাপানো হয়েছিল, যাতে এ উল্লেখ ছিল যে এ নৈশ ভোজে ষাট রকমের খাবার প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হয়। এবং তা ষ্ট্যালিন ও তার সহযোগী লোকেরা যারা এ ভোজে অংশ নেয়, সবাই তা খায়। বাস্তবেই যদি সেখানে সাম্য থেকে থাকে আর বড় ও ছোটর মাঝে কোন বৈষম্য না-ই থাকে তাহলে বলশেভিক নীতি অনুযায়ী মস্কোর প্রত্যেক নগরবাসী বলতে পারে যে, ষাট প্রকারের খাবার আমারও প্রাপ্য আর কেবল মস্কোর প্রত্যেক নগরবাসীই নয় বরং সেই দেশের ১৭ কোটি নাগরিক-ই একথা বলার অধিকার রাখে যে, আমাদেরও ওই সর্ব প্রকারের খাবার পাওয়া উচিত। তবে এটা কী সম্ভব? যদি বলো যে এটা অসম্ভব, তাহলে অন্যান্য সব বন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তোমাদের উত্তর ওই একই। বৈষম্য যদি শিকড় গেড়েই রইলো তবে সেই বৈষম্য ঘুচাতে দ্বন্দ্ব সংঘাত কেন করা হলো? আর এই ত্রুটি বিদূরীত করতে তবে অন্য কোন উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টাই বা কেন নেয়া হবে না?

বলশেভিজমে মেধাগত যোগ্যতাকে নিষ্ফল করে দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম

বলশেভিজমে বিদ্যমান এ ব্যবস্থার পরিণামে এটা ঘটবে যে, যেহেতু এতে মেধাগত যোগ্যতাকে স্বহস্তে কাজ না করার কারণে নিষ্ফল সাব্যস্ত করা হয়, এজন্য যদিও এর ফল তাৎক্ষনিক দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তবে কিছুকাল পর রাশিয়ার জনগণ যখন এটা দেখবে যে তাদের মেধাগত যোগ্যতাকে মূল্যবান কিছুই ভাবা হয় না তখণ ভ্রমণ করবার বাহানায় তারা জার্মানী বা আমেরিকায় কিংবা ইংল্যান্ড বা অন্য কোন দেশে পাড়ি জমাবে আর সেখানে গিয়ে নিজেদের উদ্ভাবনী আবিষ্কার গুলোকে রেজিষ্টার্ড করে নেবে, রাশিয়ায় থাকবে না। কেননা বলশেভিজমের নীতিতে তারা রাশিয়াতে স্বউদ্ভাবন থেকে লাভবান হতে পারছে না। তাই পরিণাম এটা দাঁড়াবে যে, বেশী উন্নততর ও ব্যুৎপত্তি মেধা সম্পন্ন যত লোকেরা আছেন তাদের বেশীর ভাগের মেধা থেকে ভিন্ন রাষ্ট্র উপকার লাভ করতে থাকলেও রাশিয়ার জন্য তা কোন কাজে আসবে না। আর মেধাবী সব লোকেরা স্বদেশ রাশিয়া ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে থাকবে। আজকাল বলশেভিক ব্যবস্থাপনার গ্রহণীয়তা এমনই যেমন বাইবেলের এই শিক্ষা, *তোমার গালে কেউ যদি এক চড় মারে তবে তুমি নিজের অপর গালটিও তাকে পেতে দাও*। এ শিক্ষা যতক্ষণ শুধু কথার কথা ততক্ষণ কানে শুনতে বড়ই ভালো লাগে। কিন্তু কাজে পরিণত করে দেখানোর সময় যখন আসে, কোন ব্যক্তিই তা কার্যকর করতে পারে না। এটা ঐতিহাসিক এক ঘটনা যে, কায়রো শহরের এক মার্কেটে একবার এক খ্রীষ্টান পাদ্রী প্রতিদিন লেকচার দিতে শুরু করল যে, মসীহ প্রদত্ত শিক্ষা প্রেম ভালবাসায় পরিপূর্ণ। কেননা তিনি বলেন, তুমি যদি এক গালে চড় খাও তাহলে অপর গালও তাকে পেতে দাও, অথচ অন্য ধর্মগুলোতে এই চড় মারাকে জুলুম বলা হয়েছে আর সেই চড়দাতাকে জালেম আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে তার বক্তৃতার ধরণ এতো প্রভাব বিস্তার করতো যে, শ্রবণকারীদের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। মুসলমান এক ব্যক্তি প্রতিদিন এ দৃশ্য দেখতো আর মনে মনে আফসোস করতো যে কোন মৌলবীই ওই পাদ্রীকে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে না কেন? কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি লক্ষ্য করলো যে, লোকদের মধ্যে মন্দ প্রভাবের বিস্তার ঘটছে। তাই, একদিন সেই পাদ্রী যখন ওয়াজ করছিল মুসলমান ব্যক্তিটি তার কাছে গেলো আর বলল, পাদ্রী সাহেব, আপনাকে আমার একটি কথা বলবার ছিল'। এতে কথা শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পাদ্রী সাহেব তার প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'বলো! কী বলার আছে'। সে কিছু বলবার পরিবর্তে হাত উঁচিয়ে পাদ্রীর গালে কষে এক চড় বসিয়ে দিলো। পাদ্রী প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেও ভাবল ওই ব্যক্তি পরবর্তীতে না আবার আরও এক থাপ্পড় মেরে বসে, তাই সেও মারার জন্য হাত উঠালো। এতে মুসলমান সেই ব্যক্তি বলে উঠলো, 'সাহেব! আপনি এটা কী করতে যাচ্ছেন, আপনার শিক্ষা তো হলো কেউ এক গালে চড় মারলে, তাকে অপর গাল পেতে দাও, আমি তো সেই অপেক্ষায় রয়েছি যে আপনি আপনার অপর গালটিও আমাকে এখন পেতে দেবেন, কিন্তু আপনি তো আমার সাথে লড়াইয়ে নেমে যাচ্ছেন'। সে (পাদ্রী) বলতে শুরু করলো যে, 'আমি আজ বাইবেলের শিক্ষা নয় বরং তোমাদের নবী করীমের শিক্ষার উপরই আমল করবো'।

বলশেভিজমের ফলে রাষ্ট্রে বিদ্রোহ ঘটবার আশঙ্কা থাকে

কতিপয় শিক্ষার কথা বলতে ভালই শুনায় তবে বাস্তবে তা খুবই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। এ কারণেই বলশেভিজমের

বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি ধাবিত না হওয়াই উচিত। তারা এখনও 'জার' এর নির্যাতনের কথা মনে রেখেছে। কিন্তু সেই জুলুমের কথা যেদিন তারা ভুলে যাবে আর এই স্বাভাবিক বোধোদয় তাদের ঘটবে যে আমাদের চাহিদার ষোল আনাই আমাদের পেতে হবে। নব প্রজন্মের মনে এ ধারণা এতো ব্যাপকতা লাভ করবে যে তারা বিদ্রোহ করবে আর এই শিক্ষার প্রতি এমনই বিদ্বেষ প্রকাশ পাবে যে সমগ্র বিশ্ব হতবাক হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের বিধানে বিদ্রোহ করার কোনই অবকাশ নেই তবে দুর্বলতা দেখা দিতেই পারে, কেননা সেটা এক স্বাভাবিক পরিণতি।

দেশের ধন-সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

এবারে আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আসছি যা প্রকৃতপক্ষে আমার বক্তব্যের মূল কথা। তবে এর পূর্বে একটি প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে, যার শুরাহা করা প্রথমে আবশ্যক। আর তা হলো এই যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় নব্য আন্দোলন থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সব ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ে একমত যে দেশের ধন-সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের তথা সরকারের অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকা উচিত। 'পুরাতন কর ব্যবস্থা' সেই স্কীম বা পরিকল্পনার কার্যকর রূপ দিতে পারবে না, যা এই বিভিন্ন পরিকল্পনাকারীদের হৃদয়ে সুপ্তাবস্থায় আছে। আর তারা চাচ্ছে যে, নতুন নতুন 'কর' বসানো যাক, নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক যাতে বিত্তশালীদের ধন-সম্পদ তাদের করায়ত্ত থেকে মুক্ত করে নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া যায়। তাই, তারা বলে গরীবদের প্রয়োজন পুরা করতে হলে ট্যাক্স তো বাড়াতেই হবে, বিদ্যমান কর ব্যবস্থায় এই সঙ্কটের সমাধান সম্ভব হবে না।

এবারে প্রশ্ন হলো এ ব্যাপারে ইসলাম কোন পন্থা অবলম্বন করেছে? তারা বলে, তোমরা যাকাত ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটিয়েছো। কিন্তু তোমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যাকাত কী সেই উদ্দেশ্য পুরা করতে পারছে যে, প্রতিটি গরীব বস্ত্র পাচ্ছে, প্রত্যেক দরিদ্রের খাবার জুটছে, বাসস্থান পাচ্ছে প্রতিটি গরীব ব্যক্তি আর প্রত্যেক দরিদ্রই চিকিৎসার্থে ঔষধও পাচ্ছে। এর যথার্থ উত্তর আমার এটাই যে, না অর্থাৎ এর সঠিক বিশ্লেষণাত্মক উত্তর আমার এটাই যে অবস্থানুযায়ী এ যুগে রাষ্ট্রের হাতে অবশ্যই অধিকতর অর্থ-সম্পদ থাকতে হবে যতটা যাকাত ইত্যাদী আকারে পূর্বে থাকতো।

আগে সরকারের ওপর কেবল এই দায়িত্ব ছিল যে, কর আদায় করে তারা রাস্তা ঘাট বানাবে, হাসপাতাল নির্মাণ করবে, শিক্ষালয় স্থাপন করবে, সৈন্য সামন্ত রাখবে আর অনুরূপভাবে প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আরও বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করবে। কিন্তু এখন নতুন এক দায়িত্বও সরকারের ওপর বর্তায়। বিশ্ব নিজেদের মত করে দরিদ্রদের খাবার খাইয়ে দেখে নিয়েছে যে, তারা ওই দরিদ্রদের খাওয়াতে সক্ষম নয়, একই ভাবে তারা তাদের খাদ্য সরবরাহ করায় প্রচেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু তাতেও তারা সফল হতে পারেনি, একই ভাবে তাদের ঔষধ সরবরাহ করায় প্রচেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু তাতেও তারা সফল হতে পারেনি। অতএব এখন এই প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে, এই যাবতীয় চাহিদাগুলো সরকার পুরা করে দিক। প্রত্যেকের পরণের কাপড়, আহারের জন্য খাদ্য, থাকবার জন্য বাসস্থান আর রোগ ব্যাধি নিরাময়ের ঔষধ-পথ্য এসব সরবরাহ করে দিক। আর এ বিষয় ইসলামও সমর্থন করে যে, যাবতীয় এই কাজগুলো সরকারের দায়িত্ব। অতএব, যেহেতু এটা সর্বজন সমর্থিত বিষয় তাই সরকারেরই এ কাজগুলো করা উচিত। আর ইসলামও যখন এটা সমর্থন করেছে তাই এটা বিধিসম্মতও বটে যে, হয় ইসলাম আমাদের এটা জানিয়ে দিক যে যাবতীয় এই চাহিদাগুলো যাকাতের অর্থ থেকেই পুরা করা যেতে পারে, অথবা যাকাত ছাড়া আরও কোন প্রতিবিধান রয়েছে, যা ইসলামে উপস্থাপিত হয়েছে।

দরিদ্রদের চাহিদা পুরণে যাকাত ভিন্ন অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থার আবশ্যকতা

এটা গুরুতর এক প্রশ্ন যা এখন উত্থাপিত হচ্ছে। আর এরই প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। আমাদের দাবী যদি এটা না হতো যে, যাবতীয় এইসব চাহিদা পুরণের দায়-দায়িত্ব ইসলাম সরকারের ওপর বর্তিয়েছে তবে এ প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু আমরা যখন মেনেই নিয়েছি আর ঘোষণাও দিচ্ছি যে ইসলামই সেই ধর্ম যা এই শিক্ষা দেয় যে, গরীব ও ধনীদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর এভাবে তাদের পরস্পরকে নিকটতর করে দিতে হবে যাতে এমনটা উপলব্ধি না হয় যে, ধনীরা ভিন্ন এক সৃষ্টি আর গরীবরা অপর কোন জীব, বরং বিত্তবানরা নিজেদের চাহিদা যেভাবে পুরা করতে পারে গরীবেরাও তেমনিভাবে তাদের নিজেদের চাহিদাগুলো পুরা করে নিতে সক্ষম, তারা বিনা চিকিৎসায় থাকে না, অনাহারেও রয় না। বস্ত্রহীন হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় তাদেরকে থাকতে হয় না। তারা-অশিক্ষিত ও নিরক্ষরও হয় না, নয় তারা বাস্তহারাও। অতএব, জরুরী হয়ে পড়ে যে, ইসলামী বিধান এসব সমস্যা নিরসন করুক। যাকাতের নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। তবে আমি আমার বক্তব্যে স্বীকার করে এসেছি যে যাকাত ব্যবস্থা সমস্যার পুরো সমাধান নয়। অতএব প্রশ্ন উঠে, তাহলে ইসলাম এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য কী পথ বাতলায়? (চলবে)

ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

জাপান

১৯০২ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সম্মানে জাপানে তবলীগের ব্যাপারে আলোচনা হলে, তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা চাইলে সেদেশে সত্যের অনুসন্ধানী সৃষ্টি হবে।" [বার্ষিক আল ফযল, ১৮ বর্ষ ডিসেম্বর, ২০০৬ পৃষ্ঠা-৮৩, কলাম-১]

এরপর ১৯০৫ সালের ২৬ আগষ্ট তারিখে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে জাপানে ইসলামের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষিত হচ্ছে মর্মে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে জানানো হলে তিনি বলেন, "...জাপানীরা উত্তম ধর্মের অনুসন্ধান করছে.....এ জন্য আমাদের জামা'তের কিছু লোককে প্রস্তুত করা উচিত। যারা সাহসী এবং লোকজনকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম।" (আল বদর, আগষ্ট, ১৯০৫ ২য় পৃষ্ঠা)

সূফী আব্দুল কাদের সাহেব নাইয়ার ৪ জুন ১৯৩৫ সালে কুবে (জাপান) পৌঁছান। তিনি সেখানে ৩ বছর অবস্থান করেন। এরপর ১৯৩৭ সনর ১০ জানুয়ারী মৌলবী আব্দুল গফুর সাহেব জাপান যান এবং তিনি সেখানে ৫ বছর অবস্থান করেন। জামা'ত ১৯৮১ সালে নাগুয়াতে একটি বাড়ী কিনে নেয়। যার নাম "আহমদীয়া সেন্টার" রাখা হয়। ১৯৮৯ সনের ২৪-৩০ জুলাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ জাপান সফর করেন। যা কোন খলীফাতুল মসীহ্ -এর প্রথম জাপান সফর। এই সফরকালীন সময়ে হুযূর (রাহে.) জাপানের মজলিসে শূরা আহ্বান করেন। হুযূর (আই.) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হিরোসিমা শহর পরিদর্শন করেন। হুযূর (আই.) সেদিন এক টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। যা সেদিন সন্ধ্যায় প্রচার করা হয়। ২০০৬ সালের ৮-১৫ মে তারিখে খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) জাপান সফর করেন। ২০০৬ সালের ৯ মে হুযূর (আই.)কে এক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়, যেখানে সংসদ সদস্য এর বিভিন্ন (ঐশীপেশার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আই.) সংবর্ধ নায় প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, "আপনারা সেই জাতি যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থা নিন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সাহায্য করুন।.....ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখুন, আজ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, তা কি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট? সন্ত্রাসবাদকে কি আরো শক্তিশালী সন্ত্রাসী দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব? মিজাইল আক্রমণ দ্বারা কি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব? (বার্ষিক আল ফযল, ১৮ বর্ষ, ডিসেম্বর ২০০৬ পৃষ্ঠা-৮৮, ৩য় কলাম)

এরপর হুযূর (আই.) ১২-১৩ মে জাপানের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। এথমবারের মত এখান থেকে খলীফাতুল মসীহ্-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ১৪ মে তারিখে হুযূর (আই.) হিরোশিমার যাদুঘর পরিদর্শন করেন। হুযূর (আই.)-এ যাদুঘরের প্রদর্শিত লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেন" "Isalute the people of Hiroshima" আমি-হিরশিমার বাসীদের অভিন্দন জানাই।

আজ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, তা কি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট? সন্ত্রাসবাদকে কি আরো শক্তিশালী সন্ত্রাসী দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব? মিজাইল আক্রমণ দ্বারা কি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব?

ফিজি

ফিজিতে সর্বপ্রথম ১৯২৫, সালে চৌধুরী আব্দুল হাকিম সাহেব ইবনে চৌধুরী কাকে খান ব্যবসায়িক কাজে সেখানে গেলে তার মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে।

এরপর সর্বপ্রথম ১৯৬০ সালের ৬ অক্টোবর তারিখে মোবাল্লেগ মোহতরম শেখ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সেখানে পৌঁছেন এবং ১৯৬০ সালের ১৩ নভেম্বর তারিখে জামা'ত রেজিস্ট্রি ভুক্ত হয়। ১৯৬১ সালে ফিজির রাজধানী সিয়াওয়া-তে একটি বিল্ডিং ভাড়া করে তবলীগি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৬১ সালের জুন মাসে মাসিক পত্রিকা "আল ইসলাম"-এর প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে একটি বাড়ী ক্রয় করে এর একটি অংশকে পূর্ণবিন্যাস করে মেহরাব নির্মাণ করে মসজিদের আকৃতি দেয়া হয়। এর নাম মসজিদ "ফযলে উমর" রাখা হয়। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এখানেই কার্যক্রম চলতে থাকে কিন্তু মসজিদ এবং মিশন হাউজ নতুন ভাবে নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পুরাতন ভবন ভাঙ্গা এবং ভিত্তি প্রস্তরের জন্য মাটি খননের কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৭৪ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এতদুপলক্ষ্যে ফিজির আহমদীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাণীতে খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন, "প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, আসসাললামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। একথা শুনে আমি যার পর নাই আনন্দিত যে "মসজিদে ফজলে উমর"-এর ভিত্তি প্রস্তরের খোদাই কাজ আপনারা নিজ হাতে করেছেন। আজ আপনারা এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন। আল্লাহ তাআলা আজকের দিনটিকে ফিজির আহমদীদের জন্য না শুধু বরং ফিজির সমস্ত মানুষের জন্য সবদিক থেকে কল্যাণ মন্ডিত করুন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে মোকাররম নুরুল হক আনোয়ার সাহেব আমীর ও মিশনারি ইনচার্জ হিসেবে ফিজি পৌঁছান। তিনি "The Muslim Harbinger" নামে তিনটি ভাষায় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। জামা'তের আমন্ত্রণে ১৯৬৪ সালে ফিজির প্রধানমন্ত্রী Sir Ratu Mara আহমদী মিশন হাউজে আসেন। মওলানা শেখ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব মোবাল্লেগ সিলসিলাহ তাদেরকে কুরআন করীম এবং জামা'তী পুস্তকাদি উপহার দেন। ১৯৭১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে

টোঙ্গা দ্বীপের বাদশাহ Tufa Ahau Tupu সরকারী সফরে আসলে মওলানা মোহাম্মদ সাদেক অমৃতসরী সাহেব, মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্ তাকে কুরআন করীম এবং বিভিন্ন পুস্তকাদি উপহার প্রদান করেন। ১৯৭৩ সালের ২৯ মে তারিখে ফিজির প্রধানমন্ত্রীকে মওলানা মোহাম্মদ সাদেক অমৃতসরী এবং মওলানা গোলাম আহমদ সাহেব কুরআন করীম এবং বিভিন্ন পুস্তাকাদি উপহার প্রদান করেন। ফিজি ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদের কাজ ১৯৬৩ সালে শুরু হয় এবং ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী মোকাররম হাফেয মালিক আব্দুল হামিদ সাহেব মোবাল্লেগ হিসেবে ফিজি পৌঁছেন। দেড় বৎসরকাল কাজ করার পর সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ আগষ্ট ১৯৮১ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সূরা বাকারা ১৫৭–অর্থৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র। এবং তাঁরই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সালের ১৬-২৫ সেপ্টেম্বর ফিজি দ্বীপপুঞ্জে সফর করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর জামা'তে আহমদীয়া নান্দীর জন্য জন্য একটি স্মরণীয় দিন, কেননা খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁদের সাথে ঈদ উদযাপন করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর হুযূর (রাহে.) ফিজির তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীর এডওয়ার্ড বেডরস-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে হুযূর (রাহে.) মজলিসে শূরায় সভাপতিত্ব করেন। ২২ তারিখে হুযূর (রাহে.) তাবেউনি দ্বীপে যান, যে স্থানটিতে আন্তর্জাতিক Date line অতিক্রম করেছে। হুযূর (রাহে.) বলেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো'– পূর্বের চেয়ে অধিক হারে এবং ব্যাপকতার সাথে সব সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে আর আজ আমার হৃদয় আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসায় আপ্লুত এবং হৃদয় সিজদাবনত। কেননা আমি স্বচক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তসমূহে পৌঁছতে দেখছি।

তিনি আরও বলেন, আপনারা আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীর একটি প্রান্তে অবস্থান করছেন..... আর খোদা তাআলার ইচ্ছায় Date line-3 এখান দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এই দেশ প্রকৃত পক্ষেই পৃথিবীর একটি প্রান্ত বলে সাব্যস্থ হয়েছে।" (আল ফযল, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, ২য় পৃ:)

১৯৮৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হুযূর (রাহে.) লাটোকা গমন করেন। যেখানে হুযূর (রাহে.) স্বীয় পবিত্র হস্তে "মসজিদে রিযওয়ান"-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হুযূর (রাহে.) ১১-১৪ জুলাই ১৯৮৯ সনে দ্বিতীয়বার ফিজি সফর করেন। ১১ জুলাই তারিখে হুযূর (রাহে.) ফিজির রাষ্ট্রপতি Ratu Sir Penaia Ganilau-এর সাথে রাষ্ট্রপতি ভবনে সাক্ষাৎ করেন।

একই দিন হুযূর (রাহে.) ফিজির প্রধানমন্ত্রী Ratu Sir Ka Isese Mara-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। হুযূর (রাহে.) একবার ফিজি সম্পর্কে বলেন, "ফিজি কোন বড় রাষ্ট্র নয়। স্বল্প পরিশ্রম ও প্রয়াসেই সমস্ত ফিজি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এ দাসে পরিণত হবে।"(আল ফযল, ৪ জানুয়ারী ১৯৮৪, পৃ: ৫ কলাম ৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ২০০৬ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ৪ মে এপ্রিল তারিখ, ফিজির অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন। ২৮ এপ্রিল জলসা সালানার ১ম দিন হুযূর (আই.) জুমুআর খুৎবা প্রদান করেন। সময়ের দিক থেকে এটি সারা বিশ্বের প্রথম খুৎবা ছিল। কেননা সারা পৃথিবীতে এরপরের দিন জুমুআর দিন ছিল। ২ মে হুযূর (আই.) তাবেউন দ্বীপ গমন করেন। যেখান দিয়ে Date line অতিবাহিত হয়েছে। হুযূর (আই.) সাক্ষাৎকারে বলেন, ফিজিতে এটি আমার প্রথম সফর। এখানে আমাদের সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। আমি তাদের সাথে দেখা করতে এসেছি। তারাও আমার সাথে দেখা করে আনন্দিত হবে। আমিও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হব।" (বার্ষিক আল ফযল, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬ পৃ: ৫৮)

হুযূর (আই.) ২৯ এপ্রিল তারিখে জলসা সালানার সমাপ্তি দিবসে সমাপনী ভাষণ রাখেন। ২০০৬ সালের ৩ মে তারিখে হুযূর (আই.) -এর সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বলেন, "আমি এসেছি আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করেছি, খুৎবা প্রদান করেছি এবং আপনাদের সাথে মতবিনিময় করেছি এবং আপনারা তা শুনেছেন। এ থেকে তখনই আপনারা ফায়দা হাসিল করতে পারবেন যখন আপনারা সেই সমস্থ নসিহত পালনকারী হবেন এবং এদেশের অধিবাসীদের বলতে পারবেন যে, আহমদী হওয়ার পর আপনাদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে; আপনারা ক্রমেই খোদার নিকটবর্তী হচ্ছেন এবং তাঁর বান্দাদের হক আদায়কারী।

নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করুন এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনাদের দেশের অধিবাসীদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করুন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন। (আল ফযল, বার্ষিক সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৬)

এডেন

১৯৩৬ সালে এডেন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পাঁচ জন নিষ্ঠাবান আহমদী ডাক্তার ছিলেন, যাদের মধ্যে ডাক্তার ফিরোজ উদ্দিন সাহেব জামা'তের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এডেনে কোন মোবাল্লেগ পাঠানোর জন্য আবেদন করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে আমরা পাঁচজন ডাক্তার মিশনের খরচ চালাতে সহায়তা করব। হুযূর (রা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ১৯ আগষ্ট মৌলবী গোলাম আহমদ সাহেব বশির এডেন পৌঁছান। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে একটি ভাড়া বাড়ীতে মিশনের কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখে ইয়েমেনের আব্দুল্লাহ্ মোহাম্মদ সাবুতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে মোহাম্মদ সাবুতি সাহেবের পুত্র মাহমুদ আব্দুল্লাহ্ সাবুতি রাবওয়ায় জামেয়া আহমদীয়াতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রে আসেন। তিনি ১৯৬০ সালে স্বীয় জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেন এবং ১৯৬০ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে মোবাল্লেগ হিসেবে যোগদান করেন।

জর্দান

১৯৪৮ সালের ৩ মার্চ তারিখে মৌলবী রশিদ আহমদ সাহেব চুগতাই হাইফা থেকে

জর্দানের রাজধানী আম্মান পৌঁছেন এবং আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানে ১৯৪৯ সালের ৭ জুলাই তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করেন। মৌলবী সাহেব ১৯৪৮ সালের ১১ মে তারিখে জর্দানের বাদশাহ-র সাথে তার প্রাসাদে সাক্ষাৎ করে আরবী ভাষায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বাণী পৌঁছান। প্রত্যুত্তরে জর্ডানের বাদশাহ্ স্বীয় স্বাক্ষরসহ জবাব প্রদান করেন। চুগতাই সাহেব জর্ডানের বাদশাহকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ছবি দেখান। সেটি দেখেই বাদশাহ বলে উঠলেন, "মা আহলা হাজিহিস সুরাত (কত সুন্দর ছবি!)"।

সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ আলহাজ্জ মোহাম্মদ আল মুআয়তাহ প্রথম ব্যক্তি যিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

মাস্কট

১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে মোহাম্মদ আব্দুল হক সাহেব চাকুরীর উদ্দেশ্যে ওমান গমন করেন। তাঁর মাধ্যমে জনাব ফতেহ মোহাম্মদ তাহের এবং মোহাম্মদ আযীয সাহেব আহমদী হন। এখানে ১৯৪৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারী তারিখে মৌলবী রওশন দ্বীন মোবাল্লেগ হিসেবে পৌছান। যাকে হুযূর (রাহে.) বলেছিলেন, "হুযূর (রাহে.) তাঁকে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি কাজের অনুসন্ধান করতে বলেন। অত:পর তিনি সেখানে জীবিকার ব্যবস্থা করে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তরবিয়ত ও তবলীগের কাজ সম্পাদন করেন।

মিশর

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় আলেকজেন্দ্রিয়ার সৈয়দ আহমদ জুহরী বদরউদ্দিন সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মৌলবী গোলাম সাহেব মিশর গমন করেন এবং আহমদীয়াতের প্রচার করতে থাকেন। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সময়ে সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ সাহেব এবং শেখ আব্দুর রহমান সাহেব লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে মিশর গমন করেন এবং তারা সেখানে তবলীগের কাজও শুরু করেন।

১৯২২ সালের শুরুর দিকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) শেখ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব ইরফানীকে মিশর পাঠান। তিনি এক বছরের মধ্যেই সফলতার সাথে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ সালের জলসা সালানায় হুযূর (রা.) বলেন, "আল্লাহ্‌র খাস ফযলে একজন ছাত্রের দ্বারা মিশরে একটি নতুন আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (তাহরীক-ই-আহমদীয়াত, খন্ড-৪ পৃ: ২৪৭)

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে ইরফানী সাহেব "কাসর-ই-নীল" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। তিনি সেখানে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেবা প্রদান করেন।

মওলানা জালালউদ্দিন শামস সাহেব মিশর গমন করেন এবং আল আযহার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রধারী পাদ্রী কামাল মনসুর-এর সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে খৃষ্টধর্ম পরাজিত হয়। একইভাবে ১৯৩৩ সালে মওলানা আবুল আতা সাহেব প্রখ্যাত খৃষ্টান পাদ্রী ড. ফিলিপস-এর সাথে বিতর্ক করেন যাতে ইসলাম বিজয়ী হয়। ১৯৪২ সালে আল আযহার ইউনিভার্সিটির উলামা মাহমুদ সালতুত এই মর্মে ফতোয়া প্রদান করেন যে, ঈসা (আ.) এর শত্রুরা না তাঁকে হত্যা করতে পেরেছে আর না তাঁকে ক্রুশে হত্যা করতে পেরেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সাধারণভাবে জীবনযাপনের পর তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন।

সিরিয়া ও ফিলিস্তিন

আনুষ্ঠানিক ভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হবার পর আল্লাহ তাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর প্রতি ইলহাম করেন, **"ইয়াদউনা লাকা আবদালুশশামী ওয়া ইবাদুল্লাহি মিনাল আরাব"** অর্থাৎ তোমার জন্য সিরিয়া এবং আরবের লোকেরা দোয়া করে। হুযূর (আ.) আরববাসীর জন্য আরবীতে পুস্তকাদি লেখেন এবং হুযূর (আ.) এর জীবদ্দশায় মক্কা মোকাররমার মোহাম্মদ বিন শেখ আহমদ, ত্রিপলীর মোহাম্মদ সাইদুল নিশার আল হামদানি, তায়েফের ইমাম উসমান সাহেব, ইয়েমেনের মোহাম্মদ আল মাগরিবি বয়আত করেন। খলীফাতুল মসীহ্ সানী লন্ডনে ওয়েম্বলী কনফারেন্সে যাওয়ার পথে ১৯২৪ সালের ১০ আগষ্ট তারিখে ফিলিস্তিনের বায়তুল মোকাদ্দাস এবং আক্কাস্থ বাহাইদের কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ১৯২৫ সালে হুযূর (রা.) হযরত মওলানা জামালউদ্দিন শামস সাহেবকে সিরিয়াতে নতুন মিশন খোলার জন্য পাঠানোর সময় তাঁকে বলেন, "আমাদের ওপর আরবের অনেক অনুগ্রহ রয়েছে কেননা আমরা তাদের মাধ্যমে ইসলাম পেয়েছি। আমাদের অণু পরমাণু তাদের কাছে ঋণী। তাদের প্রতিদান দেয়ার জন্য আমাদের এই মোবাল্লেগ সেখানে যাচ্ছেন। ১৯২৭ সালে মওলানা শামস সাহেব সিরিয়াতে খ্রীষ্টানদের প্রধান মিশনারীর সাথে বিতর্ক করেন। তার যুক্তি শুনে মুনির আল হাসানি সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। যিনি পরবর্তীতে সিরিয়ার আমীর ও মোবাল্লেগ হিসেবে সেবা করেছেন। ১৯২৮ সালের ৯ মার্চ তারিখে সরকারের পক্ষ হতে সিরিয়া ত্যাগের জন্য আদেশ জারি হলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁকে ফিলিস্তিন চলে যেতে আদেশ প্রদান করেন। তিনি ১৯২৮ সালের ১৭ মার্চ তারিখে তিনি হাইফা পৌঁছেন এবং ফিলিস্তিন মিশনের ভিত্তি রাখেন। সেখানে অনেক বিরোধিতা হয়। কাবাবীরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবদ্দশায় বয়আত গ্রহণকারী আলহাজ্জ মোহাম্মদ আল মাগরিবী আল আবলামী সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ১৯৩১ সালের ১৩ এপ্রিল কাবাবীরে "জামিয়া সৈয়্যদনা মাহমুদ মসজিদ"-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদেশে মওলানা আবুল আতা সাহেব ১৯৩১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে হাইফা পৌঁছান। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাসা আহমদীয়া কবাবীরের কার্যক্রম শুরু হয় এবং মওলানা আবুল আতা সাহেব প্রথম হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে কাবাবীরে "আহমদীয়া প্রেস" প্রতিষ্ঠিত হয়, আরব বিশ্বে এটি প্রথম আহমদীয়া প্রেস। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে "আল বুশরা" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

[তাহরীকে জাদীদের খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা অবলম্বনে] (চলবে)

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব
মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন

আমরা যা বলছি

আমরা সত্য কথা বলছি। সত্যের কথা বলছি। সত্যের ভালবাসায় যারা নিবেদিত তাদের জন্য বলছি। আমরা শান্তি, প্রশান্তি ও প্রেম সৌহার্দের কথা বলছি। আত্মার মুক্তি ও স্বর্গ জ্যোতি দর্শন লাভের কথা বলছি। আমরা পুণ্যের কথা বলছি, কল্যাণের কথা বলছি। ঐশী অধিপতি ও বিশ্ব স্রষ্টার কথা বলছি। তাঁর মনোনীত পথ ও মতের কথা বলছি। তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধি মসীহ (আ.)-এর কথা বলছি। তাঁরই মনোনীত পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের কথা এবং এর বাহক নবী গুরু বিশ্ব নবীর কথা বলছি। আমরা মানুষে মানুষে দ্বন্দ, বিদ্রোহ, বল প্রয়োগ ও কলহ রহিত করার কথা বলছি। "যুদ্ধ নয়, মৃত্যু নয়, সোহাগ ও স্নেহেই সম্ভব বিশ্ব জয়"–আমরা সে কথাই বলছি। আমরা সকল ধর্মের সবার সাথে বন্ধুর বন্ধনে সহ অবস্থানের কথা বলছি । পরমত ও পরমধর্মের সাথে সহনশীল ও সহিষ্ণু পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলছি।

ধর্ম হিসাবে ইসলাম সর্বেসর্বা এবং আমরা সেই ধর্মের অকৃত্রিম বিশ্বাসী আর এ বিশ্বাসে কেউ বল প্রয়োগে বাধা দেয়ার অধিকার রাখে না আমরা সেই সত্য কথাগুলিই বলছি। বর্তমান এ সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতিতে যুগ ইমাম গোলামে আহমদ আসার প্রয়োজন যাঁর কথা স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) নিজেই বলে গিয়েছেন আমরা সেই ভবিষ্যদবাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই বলছি। আমরা ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর কথা বলছি। মানুষের হেদায়াতের জন্য আগমনকারী কোন নবী বিনা কাজে সুদীর্ঘ সময় ধরে কোন ভাবেই আকাশে সশরীরে জীবিত বসে থাকতে পারেন না যা কুরআনের বিধানকে লঙ্ঘন করে আমরা সেই সত্যের কথাই বলছি। একজন নবীকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বহু গুণ বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয় অথচ তিনি (মসীহ্ আ:) বেমালুম তাঁর দায়িত্বকে উপেক্ষা করে করে নিজ দেহের সেবায় নিয়োজিত থেকে আকাশে বসে আরাম-আয়েসে কালপাত করছেন যা নিতান্তই দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক আমরা সেই কথাই বলছি। আমরা কুরআন করীমের ৫ : ৭৬ নং আয়াত **"মাল মসীহুবনু মারইয়ামা ইল্লা রাসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসুল"** এবং ৩:১৪৫নং আয়াত **"ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির রুসূল"** আয়াতদ্বয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যাকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। প্রকৃত কথা এই যে, এই নবী অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) কোনভাবেই ১২০ বছরের বেশী জীবিত ছিলেন না আমরা চিরঞ্জীব নবী মহানবী (সা.)-এর মুখ নি:সৃত সেই পবিত্র বাণীর কথাই বলছি। আমরা ইসলামের কথা বলছি, ইসলামের নবীর কথা বলছি। এই নবীই হলো শ্রেষ্ঠ নবী এবং খাতামান্নাবীঈন তাঁর আনীত ইসলামই হলো পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ ধর্ম এবং একমাত্র জীবত ধর্ম আমরা কেবলই একথা বলছি। এ জীবিত ধর্মের প্রবর্তকের একান্ত অনুগামীতে প্রয়োজনবোধে এ ধর্মে উম্মতি নবীর আগমন হবে আর এ বিশেষ বিধান এ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রমাণ করে আমরা ইসলামের এ মাহাত্ম্যের কথাই বলছি। আমরা কুরআন করীমের ২৪ : ৫৬ নং আয়াতের কথা বলছি, যার মর্মার্থ কোনভাবেই বলে না যে, পৃথিবীগায় নবী আগমনের দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বরং এখানে মহান আল্লাহ্‌র ওয়াদা হলো" "যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে কিনা তিনি তাদের পুর্ববর্তীগণের মধ্যে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন" । অন্যত্র খোদা তাআলা আরো বলেন, যে, "তিনি যে কোন সময় তাঁর যে কোন আনুগত্যকারীকে নবী সিদ্দীক এবং শহীদ সালেহ এ বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন" (৪ : ৭০)।

খোদা তাআলার এ উক্তিদ্বয় কোনভাবেই প্রমাণ করে না যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে উম্মতি নবীর আগমন দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ অমূলক সিদ্ধান্তকে আমরা কোন ভাবেই স্বীকার করি না। আমরা অবিসংবাদিত এ সত্যকেই কেবল বলছি। মহামহিমান্বিত সে রাসূল (সা.)-এর উম্মতে নির্ধারিত সেই উম্মতি নবী যথা সময়ে যথাস্থানে আগমন করেছেন এবং তাঁর জন্য নির্ধারিত যাবতীয় কার্য তিনি যথাযথভাবে সম্পন্ন করে গিয়েছেন আমরা সে সব সংবাদ দিতেই কথা বলছি। এ ঐশী সত্যের প্রক্ষে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর দুই গোলার্ধে দুই সনে (১৮৯৪, ১৮৯৫) বিজ্ঞানের বিধান লংঘন করে ২ টি গ্রহণ দেখিয়েছে, এ ছাড়া এ মহান ইমাম আগমন সময়ে উষ্ট্র বেকার হবে, গায়িকা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সমাজের নেতা ফাসেক হবে, মসজিদগুলি ইবাদত শূন্য হবে, গান বাজনার আসর প্রসার লাভ করবে..... । পৃথিবীময় বর্তমান তান্ডব আলামত ও মানুষের কুরুচিপূর্ণ কর্মকান্ড যে উক্ত সত্যেরই সত্যায়ণ করছে আমরা কেবলই সে কথাগুলি বলছি, আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, "মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্মির রিযালিকুম ওয়ালা কিররাসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীঈন"। মহান কুরআনের পবিত্র এই আয়াতকে (৩৩ ; ৪০) আমরা কোনভাবেই অবমূল্যায়ন করি না বা ছোট করে দেখি না, এর প্রতি বিন্দুতুল্য অপমান করা ও অবহেলা করাকে আমরা নির্ঘাৎ অনৈসলামিক কাজ বলে মনে করি। যে এমনটি করার সাহস করে সে নির্বোধ এবং অপবিত্র। ইসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তার জ্ঞান একেবারেই শূন্য।

আমরা একথাও বলি যে, তিনি (সা.) শেষ নবী, তবে খোদা তাঁকে যেভাবে শেষ বলে বলতে বলেছেন আমরা ঠিক সেভাবেই তাঁকে শেষ বলে বিশ্বাস করি।

উল্লেখ্য যে, আয়াতের মর্মকথা মহানবী (সা.)কে যেভাবে মূল্যায়ণ করে আমরাও ঠিক সেভাবেই তাঁকে বিবেচনা করি। এ আয়াত বাক্য নবী করীম (সা.) শেষ নবী বলে সিদ্ধান্ত দেয় না বরং নবীগণের মোহর খেতাবে সম্মানিত করে। খোদার সান্নিধ্য লাভের চরমত্বে পৌছার অঙ্গীকার করে। আমরা কেবলই একথাগুলি বলছি। আমরা একথাও বলি যে, তিনি (সা.) শেষ নবী, তবে খোদা তাঁকে যেভাবে শেষ বলে বলতে বলেছেন আমরা ঠিক সেভাবেই তাঁকে শেষ বলে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ নবুওয়াতের গুণাবলী ও সৌন্দর্য সার্বিকভাবে তাঁর স্বত্তায়

পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে পূর্ণতমভাবে বিকশিত হয়েছে, কেবল এ অর্থেই তাঁকে (সা.) শেষ নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমরা কেবলই এ কথাগুলি বলছি। যদি বা এখানে 'খাতাম' শব্দের অর্থ কেবলই সর্বশেষ নবী বলে অর্থ করা হয় তবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কতিপয় উক্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। যার ফলে কিনা ঈমান স্খলনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ইসলাম অনুসরীগণের পুণ্যবতী মাতা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন তোমরা তোমাদের প্রিয় নবী (সা.)কে খাতামান্নাবীঈন বল, কিন্তু তাঁর পর আর কোন প্রকারের নবী নাই এ কথা বলো না (মনসুর)। আমরা কেবলই এ মহৎ মহান সিদ্ধান্তগুলিকে বলছি, মানুষের কর্ণ দ্বারে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। আমরা বিগত দিনে আগত ধর্মাকাশে যাঁরা ছিলেন বিত্তবান, মহাজ্ঞানী, মহাজন, হাদীস ও কুরআনে যাঁদের জ্ঞান ছিল প্রগাঢ় প্রখর সেই ঋষী মহর্ষি ও খ্যাতিমানগণের যাঁরা এ আয়াতের যে অর্থ করতেন এবং যে ব্যাখ্যায় অন্যদেরকে ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী করতেন আমরা সেই তাদের কথাগুলিই বলছি। তাদের গুণ ও জ্ঞানের আলোতে তারা এসব তত্ত্বকথার যে বিশ্লেষণ করতেন যে ধারায় মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করতেন আমরা সেই তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাদের কথাগুলিই বলছি। আমরা কুরআনের কথা বলছি, ইসলাম মানুষকে যা বলতে বলে আমরা কেবলই সেসব কথা বলছি এবং প্রচার করছি। সুতরাং অজ্ঞদের ন্যায় তোমরা আমাদেরকে অবাঞ্চিত বলো না।

আমরা এ কথাও বলছি যে, আমরা মুসলমান, যে নিজেকে নিজে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় সে অবশ্যই মুসলমান। ইসলাম তাকে অবশ্যই মুসলমান বলে স্বীকৃতি দেয়। আমরা কলেমা নিজে পড়ি অন্যকেও পড়াই। কুরআনকে ঐশীগ্রন্থ বলে মান্য করি, অন্যকেও অনুরূপ ভক্তিতে মান্য করতে উদ্বুদ্ধ করি। আমরা অন্যকে সালাম দেই এবং অন্যের সালামকে সাদরে গ্রহণ করি। আমরা নামায পড়ি, যাকাত দেই, হজ্জ করি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে প্রগাঢ় আস্থা রাখি ও কিয়ামত দিবসকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। অন্য মুসলমানের জবাই করা পশুর মাংস খাই। অন্যের অনিষ্ট করা থেকে নিজের হাতকে সংযত রাখি, সুতরাং আমরা মুসলমান (আল হাদীস)। আমাদেরকে এ পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা থেকে কেউ যেন বিরত রাখার চেষ্টা না করে। আমাদের এ অধিকার থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না করে। আমরা আমাদের এ আবেগ আবেদনের কথাই বলছি। আমরা এ কথাও বলছি যে, যারা আমাদের সাথে বিদ্রোহের আচরণ করছে তারা ভুল করছে, তারা অন্যায় করছে। আমরা কারোর ধর্মমত প্রচার -পালনের স্বাধীনতায় কখনো বাধার সৃষ্টি করো না সুতরাং আমাদের ধর্মমত প্রচার-পালনেও যেন কেউ বিঘ্নতার সৃষ্টি না করে। আমরা সে কথাগুলিই বলছি। আমরা বলছি "লা ইকরাহাফিদ্দীন" (২ : ২৫৭), "লাকুম দীনকুম ওয়ালিয়াদ্বীন" (১০৯ :৭)

সুতরাং হে সত্য অন্বেষণকারীগণ! সত্যের সন্ধান করুন। আপনারা আসুন এবং বসুন। আমাদের বলা কথাগুলিকে পরখ করুন। ধর্মীয় বিধান মাপকাঠির দ্বারা তা পরিমাপ করুন আমরা কি বলতে গিয়ে কী বলছি, অন্যের প্ররোচনায় স্বীয় বিবেক বুদ্ধির বিচার শক্তিকে জলাঞ্জলী দিবেন না। আমরা আমাদের কথাগুলিকে কেবল আপনার সৌজন্যেই বলছি। আমরা প্রকাশ্যে বলছি, জনসমুদ্রেও বলছি। গোপনে কিংবা সংগোপনে নয়। আমরা একজনকে বলছি বহুজনকেও বলছি। আমরা বলছি তো বটেই, শুনার জন্যও বলছি। আমরা লিখে বলছি, বক্তৃতা সমাবেশে বলছি। এমটিএর দ্বারা আকাশ রথেও বলছি। প্রকৃত সত্যের তালাশ করতে বলছি। আমাদের প্রিয় নেতা যুগের ইমাম হযরত মসীহেজ্জামান (আ.) যিনি আমাদেরকে বলতে বলেছেন তিনি বলেন, "ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন, প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে" (বয়আতের শর্ত)। "যার কর্ণ আছে শ্রবণ করুক। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমার বলা কথাগুলিকে স্মরণ রাখিও যে, পরিণামে নূহ ও লূত (আ.)-এর সময়কারমত প্রলয় ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে খোদা আমার সত্যতাকে প্রকাশ করবেন। আমার বিরুদ্ধবাদী আলেম এবং তাদের সাথীরা আমাকে বিনাশ করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি কিন্তু পরিশেষে খোদা আমাকে জয়ী করেছেন। মিথ্যা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মিথ্যাকে স্বীয় পায়ের নীচে পিষিয়ে না ফেলা পর্যন্ত খোদা কখনও ক্ষান্ত হননা।" (হাকীকাতুল ওহী পৃ: ২১৫-২১৬)। উল্লেখ্য যে, যদি আমরা আমাদের বলায় কভু মিথ্যা রচনা করে কিছু বলে থাকি তবে ন্যায় বিচারক খোদা অবশ্যই আমাদের সাথে অনুরূপ কঠোর আচরণ করতেন যেরূপ কিনা তিনি পূর্বে মিথ্যাবাদীর সাথে করেছেন। পরন্তু খোদা আমাদের বলা কথাগুলিকে মোটেই অনুরূপ করেন নি বরং উত্তরোত্তর উন্নতি দান করে চলেছেন। মহা সমারোহে প্রবল গতিতে পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার কাজ সহায়তা করছেন।

সুতরাং হে পাঠক! অতীব বিনয় ও অনুযোগের সাথে বলছি যে, "আল্লাহর করুণা ও কৃপা জান্নাত হতে মর্ত্যে নেমে এসেছে। একে যেন আর কোনভাবেই প্রত্যাখ্যান করো না। উঠ, পরীক্ষা ও বিচার কর। যদি তোমরা দেখ যে, যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন তিনি মহর্ষি নয় সাধারণ স্তরের লোক, সাধারণ বুদ্ধি রাখেন এবং সাধারণ কথা বলেন তাহলে তাকে বরণ করো না। কিন্তু যদি তার মাঝে অসাধারণ কিছু দেখ, যদি আশ্চর্যজনক কিছু পাও, যদি আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত ও শক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় তার মাঝেও সেই জ্যোতি: চমক দেখতে পাও তবেই কেবল তাকে গ্রহণ করে নাও (বারাকাতুদ্ দোয়া পৃ: ২৭)।

পরিশেষে খোদার কতিপয় বাক্য উপস্থাপন করে লিখার কাজ শেষ করতে চাই। 'মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ্ ঘোষণা কর। তিনিই তোমাদের ওপর রহম পাঠান এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণও (তোমাদের জন্য রহম কামনা করে)। যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, বস্তুত: তিনি মু'মিনদের ওপর পরম দয়াময়" (৩৩ : ৪২-৪৪)। এ রহম ও কল্যাণ লাভ করার কথাই আমরা বলছি।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

খিলাফত
মুসলিম ঐক্যের খোলাপথ

মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসারী মুসলমানরা সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে বিধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। অধঃপতিত মুসলমানরা আজ নেযামে খিলাফতের বরকতপূর্ণ ব্যবস্থাপনার স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সমস্ত মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, আর মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করছে না।

ইরান-ইরাক, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশসমূহের এবং উর্দুভাষী ও বাংলাভাষীদের মধ্যে অতীতে (জাতিগত) যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের লাল মসজিদকে কেন্দ্র করে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আমরা দেখেছি সেটাকেও একটা যুদ্ধই বলা চলে। আর এই সব যুদ্ধে অগনিত মুসলমান নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে। যখন এই মুসলমানরা ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখনই তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি থেমে গেছে। পৃথিবীর বর্তমান যে পরিস্থিতি, চারদিক দিয়ে মুসলমানরা আজ নানান সমস্যার সম্মুখীন, এবং সর্বত্রে মার খাচ্ছে এর কারণ কী? মুসলমানদের আজ এত অধঃপতন হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন চেতনা হয়না। শ্রেষ্ঠ নবীর, শ্রেষ্ঠ উম্মতের এই চরম অধঃপতন ও বিপর্যয় তো কখনো কাম্য হতে পারে না। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এই চরম বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ হলো তাদের মাঝে আজ কোন নেতা নেই। মুসলিম জাহান আজ নেতৃত্ব শূন্য অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে যার ফলেই এই অধঃপতন।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশ্ববাসীকে ধ্বংস ও পতন থেকে রক্ষা করে পূণ্যের পথে চালিত করার জন্যেই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি ঐশী নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য স্বীকার করে একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সুদৃঢ়তর করে প্রগতির পথে চলতে বলেছেন। আজ সমগ্র মুসলিম জাহান কোন্ পথে চলছে? আজ মুসলমানরা একক ঐশী ইমামের ছত্রছায়ায় না চলার কারণেই পরজাতির কাছে প্রচ-ভাবে মার খাচ্ছে। ফিলিস্তিনী মুসলমানরা ইহুদী চরমপন্থি অপশক্তির হাতে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হচ্ছে।

আজ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের মাঝেও ঐক্য ও সংহতি নেই। মুসলিম জাহান আজ নানা বলয়ে বিভক্ত। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্তর্ধানের পর মুসলমানদের মধ্যে ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। সৎকর্মশীল মু'মিনদের সঙ্গে মহান আল্লাহ এই খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সুরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন **"ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস্ সালিহাতি লা ইয়াস্ তাখলিফান্নাহুম ফিল আরযি কামাস্ তাখলাফাল্লাযিনা মিন্ ক্বাবলিহিম ওয়ালা ইউমাক্কিনান্নালাহুম দিনাহুমুল্লাযির তাদালাহুম ওয়ালা ইউ বাদ্দিলান্নাহুম মিম বা'দি খাউফিহিম আমনা, ইয়াবুদু নানি লা ইউশরিকুনা বি শাইআ, ওয়ামান কাফারা বা'দা যালিকা ফা উলাইকা হুমুল ফাসিকুন"** *(সুরা–নূর আয়াত ৫৬)*।

অর্থাৎ 'আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও পূণ্য কাজ করে তাদের সঙ্গে নিশ্চয় তিনি দুনিয়াতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেমন তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে। এবং নিশ্চয় তিনি সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যা তিনি মনোনীত করেছেন তাদের জন্যে, এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন তাদেরকে। তারা আমারই ইবাদত করবে এবং তারা কোনও কিছুকেই আমার সঙ্গে শরীক করবে না। এবং যারা এর পরেও অবিশ্বাস করবে তারাই হবে ফাসেক দুষ্কৃতকারী।

সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড়বে আর তারা একক নেতৃত্বে এক খলীফার অধীনে চলবে। একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আহমদীয়া খিলাফত যেহেতু ঐশী খিলাফত তাই এর মাধ্যমেই সম্ভব সকল দল ও মতের লোকদের এক পতাকার তলে আনা।

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা 'তোমাদের' বলতে বুঝিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে এবং পূর্ববর্তীদের' বলতে উম্মতে মূসায়ীকে বুঝিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই, হযরত মুসা (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে তওরাতের অনুবর্তীতায় খলীফা ছিলেন হযরত হারূন (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত প্রত্যেকেই। খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ পূর্ব-পদ্ধতির অনুসরণে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাতের পর উম্মতে মুসলেমার মাঝেও যে খিলাফত

ব্যবস্থা জারি রাখবেন তা–এই আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন। আমরা সবাই জানি, হযরত রাসূল করীম (সা.) এর লাশ মোবারকের দাফন কার্য সমাধান করবার পূর্বেই উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে খলীফা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। এই আধ্যাত্মিক ঘটনা থেকে একটা বিষয় সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলিম উম্মাহ্ কখনই খলীফার নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। মু'মিনদের জন্য নবুওয়াতের পর যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য তা হচ্ছে খিলাফত। একক নেতৃত্ব ছাড়া আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক উন্নতি কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

খলীফার মাধ্যমে মুসলমানরা এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং এক ঐশী গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী। সমগ্রমানবগোষ্ঠীকে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য এক মহান নেতার নেতৃত্বাধীনে সমবেত হয়ে বেষ্টিত থাকে। সমগ্র বিশ্বের ধনী-দরিদ্র, সবল-দূর্বল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগণকে এক সাধারণ যোগসূত্রে গ্রথিত করে প্রগতিশীল জাতিতে সংঘবদ্ধ করার জন্য ঐশী নেতৃত্বের অতি প্রয়োজন। যেহেতু একতা, সংহতি ও শান্তিশৃঙ্খলা জাতির উন্নতির প্রধান উপকরণ। আর এসবের সমাধান একমাত্র আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মাঝেই থাকে। আর সকল নৈরাজ্য থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ্ যাকে মনোনীত করেন তিনিই হলেন প্রকৃত খলীফা। এমন মহাপুরুষ সর্বদা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকেন। তাঁর আদেশ নিষেধ বিনা দ্বিধায় মানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য।

আজ আহমদীয়া খলীফার নেতৃত্বে সারা বিশ্বের ১৯৫টি দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ফলে আজ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের ত্রিত্ববাদের দেশে-দেশে ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়তে শুরু করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড়বে আর তারা একক নেতৃত্বে এক খলীফার অধীনে চলবে। একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আহমদীয়া খিলাফত যেহেতু ঐশী খিলাফত তাই এর মাধ্যমেই সম্ভব সকল দল ও মতের লোকদের এক পতাকার তলে আনা। সমগ্র মুসলিম যদি আজ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে আহমদীয়া খলীফার দিক নির্দেশনায় চলে তাহলেই পৃথিবীতে পুণরায় শান্তি ফিরে আসবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে খুব শীঘ্র সেই মহান প্রতিশ্রুত দিন দেখার তৌফীক দান করুন এবং নেযামে খিলাফতের অধীনে থেকে যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি সেই সৌভাগ্যও যেন মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে দান করেন। আর আজও যারা এই ঐশী নেযামের অধীনে এবং ঐশী খিলাফতের অধীনে সামিল হতে পারেনি তারাও যেন অতি দ্রুত এতে সামিল হয়ে যায়। আর এখনও যারা না বুঝার কারণে এই খিলাফতের বিরোধীতা করছে তারাও যেন বুঝতে পারে আহমদীয়া খিলাফতই যে প্রকৃত আল্লাহ মনোনীত খিলাফত। আল্লাহ তাআলা এমনই যেন করেন। আমীন।

মাহমুদ আহমদ সুমন

খিলাফত হারা মুসলমানের অমানবিক কর্মকান্ড

(৩য় ও শেষ কিস্তি)

অধ্যাপক কে, আলী প্রণীত মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারলাম খিলাফত হারা মুসলমানদের অমানবিক কর্মকান্ড।

হ্যা, এমনটি হবারই কথা। কেননা, মুসলমান হয়ে যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নতকে পাশ কাটিয়ে নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আরাম আয়াসের জীবন যাপন করতে চায় তবে তো মহান আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টির পাশাপাশি অশান্তি বিশৃংখলা ছাড়া ভাল কিছুর আশা করা যায় না।

সম্ভবতঃ এ প্রেক্ষাপটে জনৈক পাঠক বলেছেন,

সব মানুষের কাছে মোদের
রইলো আকুল আবেদন,
আল কুরআনের শিক্ষা লয়ে
করতে সদা দিন যাপন।
আল কুরআনের শিক্ষা লয়ে
করলে সদা দিন যাপন,
আল্লাহ্র প্রিয় মানুষ পাবে
তার একান্ত আপন।

আল কুরআনের শিক্ষা যদি
থাকে কারো অন্তরে,
এমন কর্ম করবে না সে
যা নাকি তার
জীবনটাকে নাশ করে।
চলুন এবার আমরা দেখি
আল কুরআনে বলে কী?
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত

করবেন যেভাবে পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর এটাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না এবং এরপর যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে দুষ্কৃতকারী।" (সূরা নূর : ৫৬)

ইসলামের সৌন্দর্য সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ইসলাম সেই পবিত্র ও শান্তিপ্রিয় ধর্ম যা কোন জাতির নেতার ওপর আক্রমণ করেনি এবং কুরআন সেই সম্মান যোগ্য গ্রন্থ যা জাতিসমূহের মাঝে শান্তির ভিত রচনা করেছে এবং প্রত্যেক জাতির নবীকে স্বীকার করে, এক মাত্র কুরআনই সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে এ গৌরবের অধিকারী যা নবীদের সম্পর্কে এই শিক্ষা প্রদান করেছে–

হে মুসলমানগণ! তোমরা বল, আমরা পৃথিবীর সকল নবীদের ওপর ঈমান আনি এবং তাদের কাউকে মানবে আর কাউকে অস্বীকার করবে এই প্রভেদ আমরা তাদের কারো মধ্যে করি না। (সূরা আলে ইমরান : ৮৪)।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করো না, আশ্চর্য কথা, অ-আহমদী মুসলমানরা বহু বার খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। হয়ত কোন একটি দেশে সীমাবদ্ধভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে কখনও সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বর্তমানে একজন আমীরুল মু'মিনীন আছেন, তাকে সেই দেশের খলীফা বলা হয়। কিন্তু আফগানিস্তান একটি বিভক্ত দেশ। মোটকথা কোন একটি দেশও এমন নেই যেখানে সর্বসম্মত খলীফা আছেন, যা ইসলাম চায়। আহমদীয়া জামা'ত পৃথিবীর ১৭০ টি (বর্তমানে ১৯৬ টি দেশে বিস্তৃত, প্রত্যেক আহমদী খলীফার অনুগত। আমার মনে হয় আহমদীয়াতের সত্যতার এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনও দেশ আছে, যেখানে আহমদীদের সংখ্যা খুব কম তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অথচ প্রত্যেক আহমদী তারা খলীফার সাথে সম্পর্ক রাখে। এভাবে পৃথিবীর ১৭০ টি) দেশে আহমদীয়াত ও খিলাফত বিস্তার লাভ করেছে। [২৬ নভেম্বর ১৯৯১ এমটিএ সম্প্রচারিত বাংলা ভাষাভাষিদের সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাক্ষাৎকার] হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযি.) বলেন,

'খিলাফত অর্থই তো এই খলীফার মুখ থেকে যখন কোন কথা বের হয় তখন সব পরিকল্পনা, সব প্রস্তাবনা আর সব চেষ্টা প্রচেষ্টাকে একদিকে রাখা হয় এবং মনে করা হয় যে, এখন সেই পরিকল্পনা, সেই প্রস্তাবনা ও সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা কল্যাণপ্রদ যে প্রসঙ্গে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে আদেশ লাভ হয়েছে। যতক্ষণ জামা'তে এ আত্মা সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ সব বক্তৃতা ব্যর্থ, সব পরিকল্পনা বাতিল এবং সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা অকৃতকার্য।" [জুমুআর খুতবা, ২৪ জানুয়ারী ১৯৩৬ আল ফযল, ৩১ জানুয়ারী ১৯৩৬]

দয়া করে একটু লক্ষ্য করুন

খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত

হযরত হোযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের ধর্মের শুরু হয়েছে নবুওয়ত ও (আল্লাহ্‌র) রহমতের মাধ্যমে এবং তা আল্লাহ্ যত দিন চান তোমাদের মাঝে থাকবে। অত:পর মহান আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তার নবুওয়াত পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আর আল্লাহ্ তাআলা যতদিন চান তা কায়েম থাকবে। অত:পর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন এরপর শুরু হবে যুলুম অত্যাচারের যুগ এবং তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্ যত দিন চাইবেন। অত:পর আল্লাহ্ একেও উঠিয়ে নিবেন। এরপর (পুণরায়) খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত অর্থাৎ নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত কায়েম হবে। তা হবে নবীর সুন্নত অনুযায়ী নবী করীম (সা.) আরো বলেছেন, নিশ্চয় বনিইসরাঈলরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত বিভাক্ত হবে ৭৩ দলে ঐসব ৭২ দল বিপদগামী হবে। আর মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো আমার সুন্নতের অনুসারী [মিসকাত]

অতএব আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পরপরই তাঁর একান্ত অনুগত ও প্রেমাস্পদের মধ্য হতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) ইসলামের প্রথম খলীফা নিযুক্ত হন। এবং ধারাবাহিকভাবে হযরত ওমর (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.) খলীফা মনোনীত হন। উক্ত খিলাফত হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৩০ বছর পর শেষ হয়ে যায়। তারপর তারই (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়াতের মাধ্যমে পুণরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, দুনিয়ার অনেক কিছুর পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম হয় না এবং হবেও না।

অতএব মহান আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী শেষ যুগেও হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ঐশী জামা'তের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুণরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করে একদিকে যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে অপরদিকে মহান আল্লাহ্ তাআল হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণ করে দেখালেন।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ মনোনীত মসীহের নেতৃত্বে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ডা: শেখ হেলালউদ্দিন আহমদ

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বাংলাদেশ সফর

(১২তম কিস্তি)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

১৯৮০ সালে হুযূর (রাহে.) ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় সফর করেন। আমাদের মিশন হাউস-হাডার্স ফিল্ডে যান। জামা'তী অগ্রগতির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দেন। মৌলানা সাহেবের কাজে তিনি সন্তুষ প্রকাশ করেন।

১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানে মুলতানে ছিলাম। সেখানে মৌলানা সাহেবের চেষ্টায় শত শত বয়আত হয়। হুযূর (রাহে.) তখন খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। মৌলানা সাহেবকে পত্রের উত্তরে তিনি লিখেন, আপনার প্রতিটি বয়আত আমার জন্য তোহফা এবং যখন বয়আতের তোহ্ফা পাই তখন আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হই। হুযূর (রাহে.) এই প্রাণবন্ত চিঠিগুলো এখনও আমাদের জন্য মহা মূল্যবান সম্পদ হয়ে রয়েছে।

১৯৮৮ সালে খিলাফত থেকে মৌলানা সাহেবকে বাংলাদেশে বদলী করা হয়। তখন খুলনা জামা'তের মোবাল্লেগ নিযুক্ত করা হলে আমরা খুলনায় চলে যাই। সেখানে ঐশী জামা'তের খেদমতের মাঝেই মৌলানা সাহেব ২০ মার্চ ১৯৮৯ সালে ইন্তেকাল করেন। তখন হুযূর রাবে (রাহে.) বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট আমাদের জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করে দিতে নির্দেশ দেন। ফলে আহমদনগর জামা'তের মসজিদের সামনে আমাদের জমিতে হুযূর (রাহে.) অর্থ দিয়ে একটি বাড়ী তৈরী করে দেয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকতাম। তাই একবার দোয়ার আবেদনসহ হুযূর (রাহে.) খিদমতে আমার অসুস্থতার বিবরণ লিখে পাঠাই। প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর সাহেব লন্ডন জলসা থেকে ফিরে এসে আমাকে খবর পাঠান দেখা করার জন্য। দেখা করলাম। তখন আমীর সাহেব আমার হাতে একটি পেকেট দিয়ে বল্লেন– 'হুযূরের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় তিনি বলেন, একটু অপেক্ষা করুন। ভিতরে গিয়ে তিনি এই পেকেটটি এনে দিলেন এবং বলেন, আনিসুর রহমান বাঙালির বেগমের কাছে পেকেটটি পৌঁছিয়ে দিবেন।'

পেকেটটি খুলে দেখি ঔষধের একটি ছোট পেকেট এবং পাঁচটি শিশি–সবগুলোতে ঔষধ ভর্তি এবং খাওয়ার নিয়মও লেখা আছে–সুবহানাল্লাহ্। আবেগে আমার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। ভাবি আমি অতি নগণ্য ও অতিশয় দুর্বল মানুষটির জন্য নিখিল বিশ্বের খলীফা শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজ মোবারক হস্তে ঔষধ তৈরী করে পাঠিয়েছেন। ভাবতে গিয়ে আমার আধ্যাত্মিক পিতার জন্য শ্রদ্ধায় কান্না আসে। এই শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবো! ঔষধ সেবনে আমি সুস্থ হই। এটা আল্লাহ্র ইচ্ছা, আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফা হুযূর (রাহে.) দোয়ার ফযিলত এবং তাঁর পাঠানো ঔষধের বরকত।

একজন বিখ্যাত কবির একটি পংক্তি মনে পড়ছে, তিনি পবিত্র মক্কায় হেঁটেছেন আর প্রিয় নবী (সা.)-এর স্মরণে গেয়েছেন,

'হার রাহ্ কো দেখা হে মহাব্বত
কি নযর ছে কে সায়েদ ওহ্ গুজরে
হোঁ ইছি রাহ্ গুজর ছে।'

অর্থাৎ : প্রতিটি রাস্তাকে দেখেছি মহব্বতের দৃষ্টি দিয়ে,
হয়তো তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন
'এই পথ দিয়ে।

আমরাও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) স্মরণে মহব্বতের দৃষ্টি দিয়ে হেঁটে চলেছি। হয়তো তিনিও একদিন হেঁটেছিলেন বাংলার এই জনপদ দিয়েই।"

বাঙালি আহমদীদের অতি প্রিয়ভাজন মির্যা সাহেব এদেশের জামা'ত ও জামা'তের সদস্যদের প্রতি গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, ওয়াকফে জাদীদের নাযেম এবং পরবর্তীতে সদর আনসারুল্লাহ্সহ বিভিন্ন অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ জামা'তকে সর্বদা তাগিদ ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

বিশ্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদরের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন দেশের যুব সমাজকে জামা'তী তালিম তরবিয়ত প্রদানে চাঙ্গা করে গড়ে তোলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে রাবওয়ায় পৃথক বাংলা ডেক্স চালু করা হয়। রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় অধিক সংখ্যক বাঙালি খাদেমের উপস্থিতির জন্য সর্বদা তাগিদ দিতেন এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় ভাবে ইজতেমা, তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও কুরআন ক্লাস যথার্থ ভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর দিক নির্দেশনা ছিল। তাই দেখা যায় ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইজতেমায় এদেশ থেকে একজন খাদেম

যোগদানের প্রেক্ষিতে পরবর্তী বছর ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত ইজতেমায় তিন জন উপস্থিত হন। সেই মহীয়ান ধর্মপ্রাণ খাদেমরা ছিলেন–জনাব মুসলেহ উদ্দিন খাদেম ২নং রিজিওনাল কায়েদ, নুরুদ্দিন আহমদ ঢাকা মজলিসের কায়েদ এবং এস এ নিজামী চট্টগ্রাম মজলিসের খাদেম। ফলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন সদর সাহেব বাঙালি খাদেমদেরকে স্নেহভরে বরণ করে নেন। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ :

রাবওয়ায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

অপরাপর বছরের মত এবারও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সালানা ইজতেমা রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমা শুরু হয় ২০ অক্টোবর জুমুআর নামাযের পর এবং একাধারে তিন দিনের ইজতেমা ২২ অক্টোবর রবিবার আসরের নামাযের পর সমাপ্ত হয়। সালানা ইজতেমায় সাধারণতঃ প্রত্যেক বছরই সদর হতে পূর্ব পাকিস্তানের জামা'ত সমূহের নোমায়েন্দা আহ্বার করা হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে নোমায়েন্দা প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। গত ১৯৬৬ সালে এখানকার একজন মাত্র নোমায়েন্দা ইজতেমায় যোগদান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ফজলে এবার ১৯৬৭ সালের ইজতেমায় তিনজন প্রতিনিধি ইজতেমায় যোগদান করেন। তাঁরা হলেন–চট্টগ্রাম হতে জনাব মুসলেহ উদ্দিন খাদেম, ২নং জোনের রিজিওনাল কায়েদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব এস, এ, নিজামী ও ঢাকা থেকে ঢাকা মজলিসের কায়েদ জনাব নুরুদ্দিন আহমদ।

২০ তারিখ বাদ জুমুআ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) রাবওয়ার এক প্রকাশ্য ও বিস্তৃত ময়দানে ইজতেমার উদ্বোধন করেন এবং নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খেলাধূলা, তালিম ও তরবিয়তী বক্তৃতা, সওয়াল ও জওয়াব. এলমী মেলা মেসা, মজলিসে শূরার বৈঠক ও তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্য দিয়ে ২২ অক্টোবর রবিবার আছর নামায বাদ সমাপ্ত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) পুরস্কার বিতরণের পর আহমদীয়া জামা'তের তরক্কী ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের ভ্রাতাগণ পূর্ব পাকিস্তানের নোমায়েন্দাদেরকে বড়ই মহব্বত এবং সমাদর করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এ জন্য উত্তম পুরস্কার দিন। তিন নোমায়েন্দাকেই মজলিসে শূরার সদস্য করা হয় এবং দপ্তরে আসাসীর বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আলোচনায় তাঁরাও অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের নোমায়েন্দাদের মধ্যে এস. এ. নিজামী সাহেবকে ২১ অক্টোবর সন্ধ্যায় মজলিসে কিছু বলার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন, যা উপস্থিত ভ্রাতাদেরকে মুগ্ধ করে।

আল্লাহ্র পরম করুণায় এবারের ইজতেমায় পূর্ব পাকিস্তান যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। ইজতেমা শেষে ২৩ অক্টোবর এস, এ, নিজামী সাহেব চট্টগ্রামের পথে ঢাকা পৌছেন। জনাব মুসলেহ্ উদ্দিন খাদেম ও নুরুদ্দিন সাহেব ২৫ তারিখ করাচী রওয়ানা হইবেন এবং তথাকার জামা'তের কার্যাবলী পরিদর্শন করে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করবেন (পাক্ষিক আহমদী, ৩০ অক্টোবর, ১৯৬৭)।

বিশ্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দিক নির্দেশনায় ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে বকশীবাজার দারুত তবলীগে এক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা স্থানীয় মজলিস এর আয়োজক হলেও বাস্তবে তা আঞ্চলিক প্রোগ্রামের রূপ লাভ করে। ফলে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন মজলিসের খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণে কর্মসূচি প্রাণবন্ত সার্থক ও সফল হয়। তালিম তরবিয়তী ক্লাসের প্রতিবেদন ঢাকা মজলিসের কায়েদ জনাব নুরুদ্দিন আহমদ সদর সাহেবের সদয় অবগতির জন্য পেশ করলে তিনি এতে অত্যন্ত খুশী হন। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি হল :

ঢাকায় তরবিয়তী ক্লাস

ঢাকায় অনুষ্ঠিত তরবিয়তী ক্লাসের সাফল্যে আনন্দিত হয়ে কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকা-চট্টগ্রাম বিভাগের আঞ্চলিক কায়েদ প্রফেসর মোসলেহ্ উদ্দিন খাদেম সাহেবকে খোশআমদেদ জানিয়ে টেলিগ্রাম করেন। তিনি তাঁর টেলিগ্রামে মুসলেহ্ উদ্দিন সাহেবকে তাঁর ভালোবাসা ও সালাম সকল খোদ্দাম ভ্রাতাকে পৌছাতে বলেন (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৭)।

পরবর্তী বছর পূর্ব পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ১৫ জুন ১৯৬৮ তারিখ থেকে তিন সপ্তাহব্যাপী ঢাকায় এক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাঙালি আহমদীদের প্রাণের মানুষ সদর সাহেব একটি অমূল্য পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন। প্রেরিত বাণীর প্রেক্ষিতে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্ন রূপ :

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত তালিম-তরবিয়তী ক্লাসের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সদর সাহেবের পয়গাম

গত প্রাদেশিক মজলিসে শূরার ফয়সালানুযায়ী ঢাকায় তিন সপ্তাহের প্রদেশব্যাপী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার একটি তালিম তরবিয়তী ক্লাস গত ১৫ জুন '৬৮ থেকে শুরু হয়। জুমুআ দিনে তাহাজ্জুদের নামাযের মধ্য দিয়ে ক্লাসটি আরম্ভ হয়। ঢাকা ছাড়াও প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা যথা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, খুলনা প্রভৃতি জেলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত খাদেমরা এতে যোগদান করেছেন। আল্লাহ্র ফযলে

আধ্যাত্মিক পরিবেশে সুযোগ্য মুরব্বী ও নেতৃবর্গের পরিচালনায় মহা সাফল্যের সাথে তালিম ও তরবিয়তী ক্লাসটি এগিয়ে যাচ্ছে।

ইতিপূর্বে রাবওয়াস্থ কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর, হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব এই ক্লাস পরিচালনার উদ্যোক্তাদের প্রতি খোশআমদেদ জানিয়ে উপস্থিত সকল ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পয়গাম পাঠিয়েছেন। সকলের অবগতি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তা নীচে দেওয়া গেল :

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত তিন সপ্তাহ ব্যাপী এক তরবিয়তী ক্লাশ উদযাপনের সংবাদে আমি অতীব আনন্দিত।

বাংলার মুসলমানেরা স্বভাবত: ধর্মভীরু, এতে আল্লাহ্ আপনাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তরীতে আরোহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তাই এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। যে কোন বিপ্লবের পিছনে রয়েছে যুবকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অবিশ্রান্ত অধ্যাবশায়–ইতিহাস তার সাক্ষী। আপনারা নৌজোয়ান ; তাই সকল দু:সাধ্য কর্ম সাধনের দায়িত্ব আপনাদের ওপর আরোপিত। একটি বৃদ্ধের পক্ষে একটি ভারী বোঝা বয়ে নেওয়া কঠিন, কিন্তু আপনাদের পক্ষে তা সহজ হতে সহজতর। তেমনি দূর দুরান্তে গিয়ে ইসলামের তবলীগ করা বৃদ্ধের পক্ষে কষ্টকর হলেও খোদ্দামের পক্ষে তা সহজ সাধ্য। মহানবী (সা.)-এর সময়ে বিশ্বময় পবিত্র আলোর যে ঝলকানি দেখে গেছেন, এখন আপনাদের ভিতর দিয়ে জগত তার প্রত্যক্ষ রশ্মি দেখতে পাচ্ছে। উপমা হিসেবে মনে করুন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের অনিন্দ্য সৌন্দর্য নিকেতন এই ঢাকা নগরী। আপনাদেরই সমবয়স্ক যুবকেরা নৈশ অভিসারে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অলিতে-গলিতে, পার্কে ভীড় জমাচ্ছে। অথচ আপনারা ধর্মের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ মসজিদে সমবেত হয়েছেন। সন্ধ্যায় অনেক যুবক টিকিট ক্রয় করে সারি বেঁধে প্রেক্ষাগ্রহে প্রবেশের অপেক্ষায় অধীর হয়ে পড়ছে, আর মসজিদে আপনারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেজদায় যাবার জন্য বিগলিত চিত্তে অপেক্ষা করছেন। এসব কি কম গর্বের কথা!

বর্তমান যুগে সময় ও অর্থ উৎসর্গ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু স্বল্পকাজেও সওয়াব অধিক। মানুষ আজ যার যার সুখ সচ্ছন্দ নিয়ে মশগুল। ইসলামের জন্য আজ কারো চোখে পানি ঝড়ছে না। পাশ্চাত্যে বিষাক্ত হাওয়া আজ ইসলাম তরণীকে নিমজ্জিত করার জন্য ফুসে উঠছে। নাউযুবিল্লাহ্।

কিন্তু আপনাদের সুদৃঢ় নেতৃত্বে সে তরণী আজ দ্রুত মঞ্জিলে মাকসুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ কি ত্রিত্ববাদের কেন্দ্র চূড়ায় "আল্লাহ্ আকবার" ধ্বনী নিনাদিত হয়ে আকাশ বাতাসকে মুখরীত করে তুলছেনা?

আপনারা কে? আপনারা বর্তমান যুগের ভারবাহী যষ্টি। আপনারা আত্মসংযত ও দৃঢ় হউন। মোমেনের প্রত্যেক পদক্ষেপ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। আপনারা তরবিয়তী ক্লাসের মধ্য দিয়ে যে আলোক লাভ করেছেন– ঘরে ফিরে গিয়ে সে আলোতে নিজ নিজ অঞ্চলকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক সর্বদা পাঠ করবেন। জামা'তের পত্র-পত্রিকা পড়বেন। এতে বিশেষ উপকৃত হবেন। সকল অলসতা পরিহার করবেন। সুমধুর বাণীর দ্বারাই এ যুগের জেহাদ চলবে। আপনারা যখন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বাণী প্রচার করতে বেড়িয়ে পরবেন, তখন বহু লোক হাসবে, উপহাস বিদ্রুপ করবে, হয়তো তাদের হাতে আপনাদের ক্লেশও ভোগ করতে হবে। কিন্তু আপনারা অবগত থাকবেন–বিপদ মানুষের জন্য স্পর্শ মণি। জগতের নিন্দাকে আপনারা ভয় করবেন না। জামা'তের প্রতিটি আদেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। মনে রাখবেন, একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

বন্ধুগণ, দুর্গম পথ আমাদেরকে অতিক্রম করতেই হবে। কাঁটাকে উপেক্ষা করে ফুলকে লাভ করতেই হবে। এতে বিচলিত হলে চলবে না।

কঠিন ধৈর্যের তারে বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।

পরিশেষে আমি কার্যনির্বাহক কমিটি, সদর মুরব্বী ও অন্যান্য বন্ধুগণ, যাঁরা এই ক্লাশ পরিচালনায় নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ওয়াসসালাম্

মির্যা তাহের আহমদ

সদর

কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া,

রাবওয়া ১৩/৫/১৯৬৮

(পাক্ষিক আহমদী, ৩০ জুন ১৯৬৮)।

পরে মাহে রমযানে স্কুল কলেজ বন্ধ হলে ঢাকায় পুনরায় কুরআন শিক্ষা ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ৭ রমযান থেকে ২১ রমযান অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাস সফলতায় সম্পন্ন হয়। প্রদেশের বিভিন্ন মজলিসের খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন। তখন এর প্রতিবেদন রাবওয়ায় সদর সাহেবের নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে একটি বাণী প্রেরণ করেন। নিম্নে এই অমর বাণীটি উদ্ধৃত করা হলো :

আহমদীয়া যুবসংঘ প্রধানের বাণী

কেন্দ্রীয় আহমদীয়া যুবসংঘের প্রধান জনাব মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকায় আয়োজিত তরবিয়তী ক্লাসে সন্তোষ প্রকাশ করে ঢাকা ময়মনসিংহের জেলা কায়েদ শহিদুর রহমান সাহেবের নিকট এক বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি

নিম্নে প্রদত্ত হল :–

জেলা কায়েদ সাহেব, ঢাকা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

প্রাদেশিক মজলিসে শূরার ফায়সালা অনুযায়ী পবিত্র রমযান মাসে ঢাকাতে দুই সপ্তাহ ব্যাপী কুরআন ক্লাসের আয়োজনের সংবাদে আমি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি এবং আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। বর্তমান বিশ্বে কুরআনের সুমধুর বাণী দ্বারা বিপ্লব ঘটানোর ভার আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া জামা'তের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ পাকের এই সুমধুর বাণী স্বয়ং শিখা ও অপরকে শিখানো আমাদের কর্তব্য। আমরা এক মহাপুরুষের আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। আমাদের শান্তি ও সতর্কতার জন্য এই মহান দরদী বলেছেন, 'যে কুরআনকে সম্মান দেখাবে আকাশে সে সম্মান লাভ করবে ।' যদি কেহ কুরআনের উপযুক্ত মর্যাদা না দেখায় তবে মুক্তির দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত নহে। এই সকল সম্মানের অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রত্যেক আহমদীকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। হযরত আমিরুল মু'মিনীন (আই.) বলেছেন–'প্রত্যেক আহমদীকে অবশ্যই কুরআন শরীফ শিক্ষা লাভ করতে হবে।' এই সমস্ত হিতকর উপদেশ শ্রবণ বা পাঠ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, বরং একে বাস্তবায়িত করাই সমুচিত। ভাব ও কাজ উভয়ই মানবের জন্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু যুক্তিহীনেরা ভাবের গন্ডীতেই মাতয়ারা থাকে।

আজ বিশ্ব এক মহাসঙ্কটে নিপতিত। শান্তির জন্য আজ সবাই ব্যাকুল। চিন্তাবিদরা বিশ্ব শান্তির জন্য ব্যগ্র। কিন্তু তারা হতাশ। এমতাবস্থায় কুরআন শরীফের সূরা দ্বারা সহজে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের আহ্বায়ক আমরা। চিন্তা করলে অতি সহজে উপলব্ধি করবেন যে, বিশ্বের সাথে আমরা বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। মহা সমুদ্রে আমাদের তরী চলছে। উত্তাল তরঙ্গকে আমরা হেয় মনে করি। কারণ আমাদের কাছে রয়েছে পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবের মুক্তির উৎস। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ওপর ইলহাম হয়েছে 'যাবতীয় কল্যাণ কুরআন শরীফে নিহিত রয়েছে।' এই সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হবার তৌফিক কি আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দান করেন নাই? নিশ্চয়ই করেছেন। উপমা স্বরূপ চৌদ্দটি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং প্রকাশ এই ক্ষুদ্র জামা'ত দ্বারা হয়েছে। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকা মহাদেশ কুরআনের আলোতে উজ্জ্বল হচ্ছে। তদ্রুপ আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যাকুল মানুষকে কুরআনের বাণীর দ্বারা শান্তনা দেওয়া হচ্ছে। অনুরূপ ভাবে দূর দূরান্তের দ্বীপগুলোতে পাক কালামের স্নিগ্ধ কিরণ ছড়ানো হচ্ছে। বিশ্ব মানবের উপকারার্থে এখনও আমাদের বহু করণীয় রয়েছে। তার জন্য উপায় এবং নব নব সূত্র কুরআন হতে আহরণ করতে হবে।

কুরআন ক্লাস খুবই ফলপ্রসু এ থেকে লাভবান হওয়া অবশ্য কর্তব্য। পুন: স্মরণ করাচ্ছি একমাত্র কাজই ভাবকে রূপ দেয়। ভাবের বাণী দিয়ে জনসাধারণকে নাচানো সহজ, কিন্তু ত্যাগী ঋষি হওয়া সহজ নয়। আমাদের ঝান্ডা পাক কালাম। এই নব নিশান নিয়ে আমরা যাত্রা করেছি। এই শোভা যাত্রায় দুর্দম অগ্রযাত্রী খোদ্দামুল আহমদীয়া সুসুপ্ত ঘুমে ভরা অলস প্রাণকে জাগিয়ে তুলে, মুহাম্মদ আরবী (সা.) কর্তৃক আনিত কুরআন মজীদের পানে উন্মাদের ন্যায় ছুটে আমরা ক্ষান্ত হব। আমাদের এই বাসনা পূর্ণ হোক। এই কুরআন ক্লাসের কামিয়াবীর জন্য যারা নিজদের অমূল্য সময় উৎসর্গ করেছেন তাদের জন্য আমরা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে উন্নতির প্রার্থণা করি (আমীন)

ওয়াস্সালাম

মির্যা তাহের আহমদ, সদর

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, রাবওয়াহ্

(পাক্ষিক আহমদী ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৮)

(চলবে)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসা

আগামী ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার পরিবর্তিত দু'টি পদের অনুমোদন

হুযূর (আই.) এমটিএ ইনচার্জ ও সেক্রেটারী অডিও ভিডিও পদে আলহাজ্ব আহমদ তবশীর চৌধুরী ও সেক্রেটারী তালীম পদে লে. কমান্ডার (অব.) জাফর আহমদ সাহেবকে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের সদর ও নায়েব সদর সফে দওম-এর অনুমোদন

হুযূর (আই.) ২০১০-২০১১ সালের জন্য জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ সাহেবকে সদর ও জনাব নঈম আলম খানকে নায়েব সদর সফে দওম হিসাবে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা উক্ত জলসা এবং পরিবর্তিত ও নতুন অনুমোদিত কর্মকর্তাদের সফলতা দান করুন

মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

ইসলাম পরিবারকে চিহ্নিত করেছে একটি মৌলিক সামাজিক বন্ধন হিসেবে। পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক তা খুবই পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক। যে কোন সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখার জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট অধিকার এবং দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। একজনের দায়িত্ব-কর্তব্য অন্যজনের অধিকার।

সকল ধর্ম এবং সকল সমাজ মাতা-পিতাকে সম্মানজনক স্থান দিয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যকে পরিষ্কারভাবে নিরূপন করে দিয়েছে।

আল্লাহ্‌র পর পিতা-মাতার কাছেই আমরা সবচেয়ে বেশী ঋণী, পিতা-মাতার কারণেই সন্তান পৃথিবীর আলো দেখে, মা তার সন্তানকে জন্মের পূর্ব থেকেই ভালোবাসেন। মাতাই গর্ভধারণের দু:খ ও অসহায় অবস্থায় সন্তানের লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করেন। শরীরের রক্ত নি:শেষ করে বুকের দুধ দিয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর পিতা-মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানদের সকল প্রকার প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা করেন। এত যে স্নেহপরায়ণ পিতা-মাতা, যাদের নি:স্বার্থ আদর-স্নেহে সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তা হবে দুশমনী ও বেঈমানীর শামিল। সন্তানেরা তাদের মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ মাতা-পিতাকে তাদের অধিকার প্রদানের মধ্য দিয়ে। মাতা ও পিতার মধ্যে মায়ের অধিকার পিতার চেয়ে বেশী। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পক্ষ থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাবার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। ব্যক্তিটি আবার জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে (সা.) বললেন, তোমার পিতা।

মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন–"আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছি, কারণ তার মাতা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে।"

হাদীসে আছে এক ব্যক্তি হুযূর (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কাজ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়? তিনি (সা.) বললেন, যথাসময়ে নামায আদায় করা। ঐ ব্যক্তি রাসূল (সা.)কে আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কি? উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেন, মাতা-পিতার প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

প্রত্যেক সন্তানের উচিত সারাজীবন পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা। তাদেরকে সম্মান করা। যদি কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে সম্মান করে তাহলে সে আশা করতে পারে ভবিষ্যতে তার সন্তান-সন্ততি তাকে সম্মান করবে।

একজন মানুষের শত ভালো কাজ খোদা তাআলার নিকট গৃহীত হয় না যদি সে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করলে আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট হন।" অন্যত্র তিনি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে আঘাত করে সে আমাকে আঘাত করে। যে ব্যক্তি আমাকে আঘাত করে সে আল্লাহকে আঘাত করে আর যে আল্লাহকে আঘাত করে সে অভিশপ্ত।'

সূরা বনী ইসরাঈল এর ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–"তোমার প্রভু প্রতিপালক নির্দেশ প্রদান করেছেন, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন–"আল্লাহ্‌ বিচার দিনে তিন ধরনের লোকদের সাথে কথা বলবেন না এবং তিনি তাদের প্রতি না দয়া প্রদর্শন করবেন এবং না তিনি তাদের ক্ষমা করবেন। এই তিন ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। (১) অভ্যাসগত মদ্যপায়ী (২) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান (৩) এমন গৃহকর্তা যে তার গৃহে পতিতাবৃত্তির ন্যায় ফাহেশার স্থান দেয়।"

যারা পিতা-মাতাকে পেয়েছে কিন্তু পিতা-মাতাকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তাদেরকে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন কখনও ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন–"সে ব্যক্তি লাঞ্চিত হয়েছে যে তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে কিন্তু তাদের সেবা করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে নি" (মুসলিম)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন–"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পাও তাহলে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং তাদের সামনে উহ্‌ শব্দটি উচ্চারণ করবে না অথবা তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সাথে সবিনয়ে কথা বলবে।" (১৭ : ২৪)

হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন–যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবি হতে চায় সে যেন পিতা-মাতার প্রতি যত্নবান এবং আনুগত্যশীল হয়। (বুখারী, মুসলিম) তিনি (সা.) আরও বলেছেন–"কোন সন্তান যদি মাতা-পিতার প্রতি একবার স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ

দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে আল্লাহ্ তার প্রতিটি দৃষ্টির জন্য একটি কবুলকৃত হজ্জের পুণ্য দান করবেন।"

সন্তান যখন বড় হয়ে যায় তখন পিতা-মাতার খাওয়া-দাওয়া, ভরণ-পোষণের দিকে লক্ষ্য রাখা তাদের কর্তব্য। অসুখ-বিসুখে তাদের সেবা করা সন্তানেরই দায়িত্ব। পিতা-মাতা যদি অর্থকষ্টে ভোগেন তাহলে তাদের অর্থাভাব দূর করাও সন্তানের দায়িত্ব।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। সন্তানদের উচিত মাতা -পিতার রূহের মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট দোয়ায় রত থাকা। মাতা-পিতার জন্য সন্তান-সন্ততি যে দোয়াটি করবে তা হলো–**"রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সাগীরা।"** অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! আমার বাবা মা ছোট বেলায় যেভাবে আমাকে দয়া ও স্নেহের সাথে লালন-পালন করেছেন আপনিও তাদের প্রতি সেভাবে দয়া করুন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন–"মাতা-পিতার জন্য দোয়া কর, তাঁদের মাগফিরাত কামনা কর, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ওয়াদা রক্ষা কর, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনকে সম্মান প্রদর্শন কর। মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত কর।"

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মহাবীর আলেকজান্ডার যখন ভারত বিজয়ে আসেন তখন তাঁর এক মন্ত্রী তাঁর মায়ের নামে অভিযোগ করে পত্রে লিখেছিলেন, আপনার মায়ের কারণে রাজকর্ম নির্বিবাদে পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। পত্রের উত্তরে আলেকজান্ডার তার মন্ত্রীকে লিখেছিলেন দেখো, আমার মায়ের এক বিন্দু অশ্রুপাতে তোমার মত শত মন্ত্রী ভেসে যেতে পারে। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করো।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মায়ের আদেশ পালনের জন্য চাকুরীর ও জীবনের তোয়াক্কা না করে বন্যা প্লাবিত দামোদর নদ সাঁতরিয়ে পার হয়েছিলেন।

হযরত বায়যিদ বোস্তামী তাঁর মায়ের আদেশ পালন করতে গিয়ে একবার সমগ্র রাত পানি ভর্তি গ্লাস হাতে মায়ের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তারা সবাই পিতা-মাতার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, মাতা-পিতার সেবায় রত থাকলে জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াব অর্জিত হবে। মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার শামিল। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দোয়া অব্যর্থ তীরের ন্যায়। তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়া সন্তানকে জান্নাতবাসীতে পরিণত করে আর তাদের বদদোয়াতে সন্তানের ইহকাল, পরকাল উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, মাতা-পিতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য কতটা জরুরী। মাতা-পিতা যদি বিধর্মীও হয় তবুও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তবে হ্যাঁ একমাত্র খোদার তৌহীদ ও শরীয়তের ব্যাপারে কোন আপোস নেই। সূরা আন কাবূতের ৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–"আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছি কিন্তু যদি তারা আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করতে বলে যাকে তুমি জান না, তারা যদি তোমার প্রতি চাপ প্রয়োগ করে, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।"

মাতা-পিতাই সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার যে ত্যাগ তিতিক্ষা তা বর্ণনা করার সাধ্য কারো নেই, মাতা-পিতার নিকট সন্তান চিরঋণী। এ ঋণ পরিশোধ করা কোন দিনই সম্ভব নয়। আজকের সমাজে এমন বহু পরিবার আছে যেখানে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই, সন্তানেরা নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত অথচ পিতা-মাতার প্রতি রয়েছে তাদের চরম অবহেলা ও অবজ্ঞা। রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, এমন সব লোক হতভাগ্য কারণ তাদের জীবনে জান্নাত অর্জনের উপকরণ তো ছিল কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করেনি, উপেক্ষা করেছে।

যুগ ইমাম ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ'-এ উল্লেখ করেছেন–"যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সম্মান করে না এবং সাধারণ বিষয়ে, যা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাঁদের আদেশ পালন করে না এবং তাঁদের প্রতি আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়। মাতা-পিতার আদেশ নিষেধ অমান্য করা, তাঁদের সেবা-শুশ্রুষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা, তাঁদের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করা, তাঁদের অন্তরে কষ্ট দেয়ার পরিণতি হলো জামা'তের গন্ডি হতে বেরিয়ে যাওয়া, যা কোন স্বচ্ছ বিবেকসম্পন্ন মানব সন্তানের কাম্য হতে পারে না।"

সুতরাং প্রত্যেক সন্তানের উচিত মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে নিজের জান্নাত ও ঈমান নিশ্চিত করা। মাতা-পিতার জন্য সন্তানদের বেশি বেশি দোয়া করা উচিত–**"রাব্বানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল-মু'মিনীন ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সাগীরা।"** অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যে দিবসে হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিবসের জন্য মাফ কর আমাকে আর মাফ কর আমার মাতা-পিতাসহ সকল মু'মিনদের। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন রহম তারা করেছিল আমার প্রতি শৈশবকালে, আমীন।

কোহিনুর বেগম (বীথি)

প্রতিমা পূজারীদের প্রতি এক আন্তরিক আহ্বান

আমরা একই দেশের অধিবাসী হিন্দু মুসলিম। আল্লাহ্ তাআলার কৃপা আমাদের সমভাবে উপকৃত করে। সূর্যের আলো, বৃষ্টির পানি, বায়ু, অগ্নি, মাটি, পৃথিবী আমাদের কল্যাণ বর্ষণ করে, তখন মুসলমানদের জন্য বেশী বা হিন্দুর জন্য কম এমন হয় না। যদিও এগুলো একই উৎস থেকে আসে। আল্লাহ্ এগুলো আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ধর্মের বেলায় যদি সেই একই উৎস আল্লাহ্ তাআলা আমাদের বিধান দাতা ও সৃষ্টিকর্তা হন তবে তার ধর্মীয় শিক্ষায় তারতম্য হবে কেন? আপনারা বলেন একমে বা দ্বিতীয়ম–এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় কিছুই নেই। পরমেশ্বর যদি নিরাকার হন যেমন–বাতাস নিরাকার। তবে সেই বাতাসকে কি রূপ দিয়ে পূজা করবেন? মানুষরূপী পুতুল লক্ষ্মী, সরস্বতী, দূর্গা, কারী রূপে নিরাকার ইশ্বরের পূজা সৃষ্ট বস্তুর রূপ দিয়ে হয়? না তা হয় না। কুকুর দেখে কি হাতী দেখার স্বাদ মিটে? মাটির পুতুলকে না দেখে মাটির পৃথিবীর রূপ দেখুন। তাতে হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে আপনা থেকেই ঈশ্বরের প্রশংসা আর অন্তর থেকে তারই গুণগান বের হয়ে আসবে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য বিধাতার কি উত্তম সৃষ্টি! বেদ, গীতা, মহাভারত এ সকল ধর্ম গ্রন্থে পুতুল পূজার উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র মূর্তি পূজা করেন নি। এসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের মনগড়া সৃষ্টি। অবতার গুণের আদর্শ থেকে মূর্তি পূজারীরা বিচ্যুত। মূর্তি অসার বস্তু, অপব্যয়, বৃথা খরচ। সমগ্র মূর্তিগুলো একত্রে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। এমনকি মাছি যদি তাদের মুখ থেকে খাবার কেড়ে খায় তাও তারা রোধ করতে পারে না। মূর্তির মুখ আছে–বলে না, হাত আছে–ধরে না, চোখ আছে দেখে না। ধরা যাক, মহাবীর দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের একটি মূর্তি ইতিহাসের প্রতীক হিসাবে কেউ তৈরী করল, যা নিছক একটি ইতিহাসের প্রতীক বা গান্ধিজির মূর্তি তৈরী হলো, কালক্রমে অতিভক্ত বা অন্ধ ভক্তের দল তারে পূজা শুরু করে দিল, এভাবে কোন না কোন পরিস্থিতিতে পূজার প্রচলন হয়েছে। এসব নব সৃষ্টি, জ্ঞান বিকার, বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ মাত্র।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) সকল মূর্তি ভেঙ্গে বড় মূর্তির ঘাড়ে কুড়াল রেখে দিয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীলরা তাকে চিতায় ভস্মীভূত করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নাই। তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি ফেতনার আগুনকে ঠান্ডা করেছিলেন এবং তারাই পরে ইব্রাহীম (আ.)কে সালাম বর্ষণ করল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর কাবার ৩৬০ টি মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে কাবাঘর খালি করেছিলেন। মূর্তির এমন কোন শক্তি ছিল না তা রোধ করতে পারে। মূর্তি পূজারীরা শক্তির মোকাবেলায় ধর্মীয় যুদ্ধে একেশ্বরবাদীদের কাছে পরাজিত হয়। বদরের যুদ্ধে ভোতা অস্ত্র সজ্জিত যোদ্ধাদের কাছে ১০০০ মক্কাবাসী তৎকালের আধুনিক অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে লাত, উজ্জা, হোবলের মত মূর্তির নাম নিয়েও নির্মমভাবে পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। হোবলের আওয়াজ প্রচন্ড নিনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত করে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। মূর্তি তাদের রক্ষা করেনি। সুতরাং আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে মূর্তির পিছনে সময় ও সম্পদ নষ্ট না করে তা যদি মানব কল্যাণে ব্যয় হয় তাতেই ঈশ্বরের সন্তুষ্টি। জীবে দয়া করে যে জন, সেই জন সেবীছে ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব ব্যাপী, তিনি সকলের মধ্যে আছেন, তিনি মানুষকে বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা স্বরূপ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য স্বর্গ নরক সৃষ্টি করেছেন–যা এই পৃথিবী থেকে শুরু হয়। আমরা নিজের অধিকারে কারো ভাগ দেয়া পছন্দ করি না, পরমেশ্বরও তাই। তার জমীনে তার শক্তিতে অন্য কোন দেবতা দখল করুন তা তিনি চান না। সর্ব ক্ষেত্রে তিনি একক শক্তির অধিকারী। দেখা যায়, সরস্বতি বিদ্যার দেবতা, কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপ সরস্বতির পূজা করে না, তাদের ঘরে ঘরে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ব্যারিষ্টার, তাদের বিদ্যা বা শক্তি বেশী। তারপর হিন্দু, কোন ধর্মের নাম নয়। সিন্ধু নদের তীরবর্তী বাসিন্দারা সিন্ধ বা হিন্দ নামে পরিচিত। আমাদের ফরিদপুর, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার লোকেরা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করে। কিন্তু ধর্মের নাম সনাতন, যা ছিল আছে এবং যা থাকবে। সাড়ে চার হাজার বছর আগের মুনি ঋষিদের কাছ থেকে শুনে বেদ লেখা হয়েছে। যার মধ্যে প্রক্ষেপন, সংযোজন হয়েছে, কিন্তু বেদের সার শিক্ষা যা মানুষের বিবেকের উৎকর্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থ আল কুরআনে একীভূত হয়েছে। কথায় বলে যা আছে পুরানে তা আছে কুরআনে।

মানবজাতি এখন বিশ্ব পরিবারভুক্ত। তাই আল কুরআন মানবজাতির সর্ব শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। আল্লাহ্ তাআলা একে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন (আল কুরআন, ১৫: ১০)। এতে প্রক্ষেপ নাই, এতে জাতিভেদ বা শ্রেণীভেদ নাই। এতে কোন অপূর্ণ শিক্ষা নেই, এতে কোন ভুল বা সন্দেহ নেই। কিয়ামতকাল ব্যাপী মানবজাতির সকল

সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে। তাছাড়া বেদে পূর্ণজন্ম বা জন্মান্তরবাদের শিক্ষা নেই। ইহা মুনি ঋষিদের সৃষ্টি। এতে বিশ্বাস করলে পরমেশ্বরের দয়া বা ক্ষমা দেখাবার সুযোগ থাকে না। পরমেশ্বর যেন বেকার এক অস্তিত্ব।

তারপর দেখুন ইসলাম ধর্ম। ইসলাম অর্থ শান্তি, এর অনুসারীদের বলা হয় মুসলিম। অর্থাৎ পরমেশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করা ও অন্যের নিরাপত্তা দান করা। সালাম দেওয়ার অর্থও তাই। **আসসালামু আলাইকুম** এর অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার ওপর শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষিত হোক। অথচ পবিত্র ধর্ম আল ইসলামে এখন বিকার দেখা দিয়ে আজিকার নামধারী মুসলমানরা চোর, ডাকাত, হিংসুটে, মিথ্যাবাদী, ঘুষখোর, সুদখোর, এরা শুধু নামেই মুসলমান এবং দলে দলে বিভক্ত। যা আল কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে–(সূরা আনআম, ১৬০)।

মুসলমানদের সংস্কারকের জন্য তাই ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন। আর খৃষ্টানদের বিশ্বাস যিশু অর্থাৎ ঈসা (আ.) এবং তার মা খোদা ছিলেন। যিশু নাকি সমস্ত খৃষ্টানদের পাপ কাঁধে নিয়ে ৩৩ বছর বয়সে ক্রুশে মৃত্যু বরণ করে অভিশপ্ত হয়ে আকাশে চলে গেছেন এবং খৃষ্টানদেরকে পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এটা যেন পাপ করার একটি লাইসেন্স–উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে। তাই দেখা যায় খৃষ্টান সমাজে বয়ফ্রেন্ড, গার্ল ফ্রেন্ড, লিভটুগেদার, মদ পান এরূপ সকল পাপ অবাধে চলছে। অথচ ঈসা (আ.) মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম লাভ করে পৃথিবীতে এসেছেন, তার খাওয়া–ঘুম ছিল। তার মায়েরও এসব ছিল। কিন্তু খোদা তাআলার এসব নাই। আর মানুষ খোদা হতে পারে না। প্রকৃত কথা তাকে ইহুদীরা জোর পূর্বক ধরে ক্রুশে দিয়েছিল। তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশে যান নাই। ক্রুশবিদ্ধ করার সময় তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন–**প্রভু ঈশ্বর তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করছো?** তারপর খোদার কৃপার ফলেই ক্রুশ থেকে উদ্ধার পেয়ে তিনি কাশ্মীরের দিকে হিজরত করেন এবং ১২০ বছর বয়সে মারা যান। কাশ্মীরে তার এবং তার মায়ের কবর রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্রুশের ঘটনার পর এই পৃথিবীতে ফল, ফুল সুশোভিত ঝর্ণা প্রবাহিত উচ্চ ভূমিতে (কাশ্মীরে) আশ্রয় দিয়েছিলেন (সূরা মুমেনুন-৫১ আয়াত)। মুহাম্মদী মসীহ্ হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ঈসা-মসীহ্ হিসাবে খৃষ্টানদের সংস্কার করার জন্য আবির্ভত হয়েছেন। তিনি মুসলমানদের মাহদী, খৃষ্টানদের যিশু, হিন্দুদের কলকি অবতার। তিনি সমস্ত মানব জাতিকে একই ধর্মে একত্র করবেন।

মুসলমানদের ৫ বারের আরাধনায় (নামাযে) সকল ধর্মের প্রার্থনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। এতে ঐশিবাক্য আল কুরআন পঠন, আল্লাহ্‌র মহিমা ও গুণকীর্তন, মানবতার কল্যাণ কামনা এবং নিজের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন খাড়া হয়ে (ইহুদীদের মতো), ঝুঁকে যেয়ে (খৃষ্টানদের মতো) এবং কাবায় যেয়ে (হিন্দুদের গয়া-কাশীর মতো) আল্লাহ্‌র নিকট আরাধনার বিধান দেওয়া হয়েছে (গীতা ৭ম অধ্যায়)। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও শক্তি নিয়ে এক মহা মানবের পুনারাবির্ভাবের কথা আছে। তার আগমনের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। নিকৃষ্ট মানব কর্মে হিংসা স্বার্থ পরতায় ভারত ভূমি কলুষিত। তাই তিনি যথা সময়ে পঞ্চ নদীর তীরবর্তী স্থান ভারতের কাদিয়ান গ্রামে এসেছেন। তার পবিত্র নাম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তার হাতে দীক্ষা নিলে (বয়আত করলে) পরমেশ্বর তাদের বিশেষ হেফাজতে রাখবেন এবং প্রার্থনা শুনবেন। তিনি আর্যবর্তকে পাপ মুক্ত করবেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস ব-য়ে দিবেন। ইতিমধ্যে বহু হিন্দু, খৃষ্টান অন্যান্য ধর্মের ভ্রাতাগণ তাকে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। আমাদের হরিনগর গ্রামে ডা. সুবোল চন্দ্রের পরিবার সহ অন্যান্য পরিবার তাকে গ্রহণ করেছেন। তার মেয়ে নিলীমা নওয়াবেকী হালকা (ছোট কুপট, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা) মসজিদে শুক্রবার নামায পড়েন। নবী বা অবতারগণ ধর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে আসেন যার ফলে মানুষ আল্লাহকে লাভ করতে পারে, যে জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে টাকা পয়সা বা সম্পদ সম্পত্তি নিয়ে আসেন না। তাঁদের তরীতে উঠতে হলে জাত, কুল, মান, ত্যাগ করে তাঁর পদতলে সমস্ত কিছুই নিয়ে আসতে হয়। তার ফলে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ লাভ হয়।

হিন্দুদের কল্কি অবতার আর মুসলমানদের জন্য কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমনের সমস্ত লক্ষণ পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আর কোন মাহদী আগমনের প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই। তিনি মানুষের ধারণা মতে আসবেন না। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আসবেন। তার যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই জাহেলিয়াতের মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'কুল্লুহুম ফিন নার ইল্লা ওয়াহিদাতান' ৭৩ দলের মধ্যে ১ দল ছাড়া বাকী ৭২ দল দোযখে যাবে। কাজেই সময় হয়েছে সচেতন ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবার। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে তৌফিক দান করুন।

মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ

দরূদ শরীফ পাঠ : নিষ্ঠা, ভালোবাসা আর অনুনয়-বিনয়ের সাথে করা জরুরী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) সেপ্টেম্বর ৫, ২০০৩ সনের খুতবায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "মানুষ তো প্রকৃতপক্ষে বান্দা অর্থাৎ দাস, দাসের কাজ তো এই যে, মালিক যে হুকুম দিবে, সেটা পালন করবে। এভাবেই যদি তোমরা চাও যে তোমরা মহানবী (সা.)-এর দয়া লাভ করবে তাহলে অবশ্যই তার গোলাম হয়ে যাও। রাসূল করীম (সা.)-এর বান্দা হওয়ার জন্য জরুরী যে, তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, তাঁর আদেশের অবাধ্যতা করো না, তাঁর সব হুকুমের পালনকারী হও।

(আল বদর, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩)

কখনো কখনো এমন প্রশ্ন উঠে যে , কতবার দরূদ পড়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক পত্রে লিখেন। "কোন সংখ্যার প্রয়োজন নেই। নিষ্ঠা, ভালবাসা, অনুনয়, বিনয়ের সাথে পড়া উচিত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত পড়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত প্রভাব, ভাবাবেগ এবং আত্মবিস্মৃতির অবস্থা সৃষ্টি না হয় এবং হৃদয়ে প্রশান্তি হয় এবং আনন্দ লাভ না হয়। আবার তিনি বলেন, "প্রার্থনার আনন্দে হৃদয় যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এবং অন্তরাত্মাময় সেই পবিত্র মুখাবয়ব সুস্পষ্ট রূপে সৃষ্টি হয়ে যায়। (মকতুবাত হিস্যা আউয়ালে পৃষ্ঠা-১৬) হৃদয়ে যেন এক পরিতৃপ্ত সুখ অনুভূত হয়। তো এখন সেই সব লোকদের প্রশ্নের জবাব এর মধ্যে এসে গেছে যারা প্রশ্ন করেন যে কতবার পড়া উচিত। এক তো নিষ্ঠা এবং ভালবাসা দেখাও। যাকে বন্ধু বানিয়েছ তাঁর নাম নিতে, তাঁর প্রশংসা করতে, তাঁকে স্মরণ করতে মানুষ গণনার বাধ্য-বাধকতা তো লাগায় না। পার্থিব বন্ধুদের জন্যও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। আর এ তো সেই বন্ধু যার স্মরণে আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জগৎ সুসজ্জিত হয়। এবং এরপর যে এমন প্রভাবদানকারী অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যে আবেগ চরম পর্যায়ে পৌছায়, তাঁর স্মরণে, তাঁর কাছে দরূদ পাঠাতে এক শান্তি এবং মজা পাওয়া যায়, এবং হৃদয়ও যেন এটাই চায় যে, মানুষ যেন সব সময় দরূদ পাঠায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আর একটি চিঠিতে লিখেন, আপনি দরূদ শরীফ পড়তে মনোযোগী হন এবং যেভাবে কেউ তার প্রিয়জনের জন্য প্রকৃতপক্ষেই বরকত চায় এ রকম আনন্দ এবং নিষ্ঠার সাথে হযরত নবী করীম (সা.)-এর জন্য বরকত চান এবং অত্যন্ত অনুনয়ের সাথে চান এবং এই অনুনয়ের মধ্যে যেন কপটতা না থাকে। বরং উচিত যে, হযরত নবী করীম (সা.) এর সাথে প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা এবং প্রকৃতপক্ষেই সত্যিকার হৃদয়ে যেই বরকত মহানবী (সা.)-এর জন্য চাওয়া উচিত যা দরূদ শরীফে বর্ণিত আছে এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসার এই নিদর্শন যে, মানুষ কখনো ক্লান্ত না হোক এবং বিষন্ন না হোক এবং না ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের প্রাধান্য হোক বরং শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই পড়া উচিত যেন মহানবী (সা.)-এর ওপর আল্লাহ্ তাআলার বরকত অবতীর্ণ হয়। (মকতুবাতে আহমদীয়া)

তিনি (আ.) আরও বলেন,

"একবার আমি কঠিন অসুখে পড়লাম এবং অসুস্থ্যতা এতদূর পর্যন্ত পৌছাল যে, তিনটি ভিন্ন সময়ে আমার উত্তরাধিকারীরা আমার শেষ অবস্থা মনে করে সুন্নত অনুযায়ী আমাকে তিনবার সূরা ইয়াসিন শোনাল। তৃতীয়বার সূরা ইয়াসীন শোনানো হাল তখন আমি কিছু ঘনিষ্ঠজনকে দেখলাম যারা ততদিনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, দেওয়ালের পিছনে অত্যধিক কাঁদছিলেন এবং আমার কঠিন শূল বেদনা হচ্ছিল এবং প্রতিমুহূর্তে রক্ত আসছিলো, ষোল দিন একটানা এমন অবস্থা চলল আর আমার সাথে আরেক ব্যক্তি অসুস্থ ছিলেন, যিনি অষ্টম দিনে মারা গেলেন অথচ তার অসুখ আমার মত শক্ত ছিল না, ষোড়শ দিনে হতাশার অবস্থা সৃষ্টি হল, তৃতীয় বার সূরা ইয়াসীন শোনান হল এবং সমস্ত নিকটজনের হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার মৃত্যু হবে। তখন এমনটা হল যেভাবে খোদা তাআলা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য নিজের কিছু নবীকে দোয়া শিখাতেন সেভাবে আমাকে ইলহামের মাধ্যমে এই দোয়া শিখালেন, **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদিও ওয়া আলে মুহাম্মদ।** (নুযূলে মসীহ্)

[দৈনিক আল ফযল, ৬ জানুয়ারী, ২০০৪ অবলম্বনে]

নাভিদুর রহমান
ছাত্র, ২য় বর্ষ
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক

সাধারণত আমাদের চার পাশে যারা বসবাস করে তারাই আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের সবাইকে প্রতিবেশীর হক আদায় করা উচিত। প্রতিদিন তাদের খোজঁখবর নেয়া উচিত। তাদের অসুবিধা কিংবা নানা সমস্যায় এগিয়ে যাওয়া উচিত। খাবারের সময় খোঁজ নেয়া উচিত প্রতিবেশীরা কেউ না খেয়ে আছে কিনা? এভাবে তাদের অসুখে -বিসুখে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা তারও খোঁজ নেয়া দরকার। এভাবেই আমরা প্রতিবেশির হক আদায় করতে পারি। কিন্তু বর্তমান সারা বিশ্বে ক'জন এমন মানুষ আছেন যারা আশে পাশের প্রতিবেশীর খোঁজ রাখছে? আমরা এত উদাসিন ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আমাদের প্রতিবেশীর খবর পর্যন্ত রাখি না। প্রতিবেশী- কেউ না খেয়ে মারা গেলেও আমাদের কোন কষ্ট হয় না। এটাই কি আমাদের প্রতিবেশীর হক আদায়? অনেক সময় দেখা যায় আমাদের আশেপাশের কত প্রতিবেশী পরিবারই নানান সংকটে দিনাতিপাত করছে, অনাহারে অছে কতই না সমস্যায় জর্জরিত, আমরা তাদের খবর পর্যন্ত রাখি না।

আমাদের যেমন আত্মীয় প্রতিবেশীর খোঁজ রাখা ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত তেমনি অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতিও ভাল ব্যবহার ও তাদের সুখে দু:খে, খোজ রাখা উচিত ।প্রতিবেশীর সাথে যদি আমরা উত্তম ব্যবহার করি তবে তারাও আমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে । অন্যের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে তবে তারাও আমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। অন্যের কাছ থেকেও উত্তম ব্যবহার আশা করতে পারি। সর্বদা পার্শবর্তী প্রতিবেশীর সাথে দেখা সাক্ষাত করে কুশল বিনিময় করা উচিত ।প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন, **"এবং সদয় ব্যবহার কর আত্মীয় প্রতিবেশী অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে ...."** (সুরা আননিসা, আয়াত ৩৭) আমাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই - নির্দেশ প্রদান করেছেন আমরা যেমন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করি । আমরা যদি আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকরতে চাই তবে আমাদেরকে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। তবে বর্তমানে বহু জায়গাতেই দেখা যায় প্রতিবেশীর সাথে -মানুষ ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। এমন কি তারা পরস্পর লাঠি সোটা নিয়ে মারামারি করছে। এসবই কী মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, প্রতিবেশীরা বির্ধমী হলেও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত। আমাদের তো দেখা উচিত না যে আমার প্রতিবেশী হিন্দু, বোদ্ধ না খৃষ্টান কারণ আল্লাহ তাআলা তো বলেননি তোমার মুসলমান প্রতিবেশীর শুধু খোঁজ রাখবে। মুলত আমার চার পাশে যে ধর্মেরই প্রতিবেশী হোক না কেন তার খোঁজ রাখা উচিত। তাদের আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণেও সাধ্যমত যোগদান করা উচিত। তাদের সাথে সবচেয়ে বড় পরিচয় তারা মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা জীব। আবু হুরায়ারা (রা:) থেকে বর্ণিত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন; আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ সে মু'মিন নয়! আল্লাহ্‌র শপথ সে মু'মিন নয়! জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারী ও মুসলিম) যে ব্যক্তির হাত থেকে তার প্রতিবেশী কোন অনিষ্টের কারণ না হয়, কোন কষ্ট না পায়। সে-ই আসলে প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি। আমাদের প্রতিবেশীরা কেউ না খেয়ে থাকলে আমাদেরকে তা খোঁজ করে দেখতে হবে। আমরা পেট পুড়ে খেলাম, অথচ আমার পাশের প্রতিবেশী পরিবার না খেয়ে আছে তা তো হতে পারে না। আমি অল্প পরিমাণে খেয়ে তাদের যদি কিছু খাবার দিই তবে তারা আমার প্রতি খুশি হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে শোকরীয়া জ্ঞাপন করবে। কোন গরীব মিসকিন যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এসে খাবার চায় তবে তাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেরত দেয়া ঠিক নয়। যা খাবার আছে তা থেকেই কিছু খাবার দিয়ে যদি তার ক্ষুধা নিবারিত হয় তবে সে খুব খুশি মনে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া করবে। আর এর ফলে আমরা বান্দার হক আদায় করতে পারব। প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখা প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, হে আবু যার যখন তুমি তরকারী পাকাও, তাতে একটু পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও, অত:পর নিজের প্রতিবেশীর ঘরের খোঁজ-খবর নাও এবং তাদেরকে এই ঝোল থেকে ভালভাবে দাও।" (মুসলিম)

আমরা আহমদী তথা প্রকৃত ইসলামের অনুসারী তাই আমাদের দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত উত্তম। আমরা যেন আমাদের আশেপাশের প্রতিবেশীর সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের বিপদে-আপদে সর্বদা খোঁজ-খবর রাখি। এটাই একজন আহমদীর উত্তম বৈশিষ্ট্যতার লক্ষণ। এ যুগে কেবল আমরাই খাঁটি মুসলমান হবার দাবি করতে পারি, তাই আমাদেরকে উত্তমভাবেই চলতে হবে। যেন অ-আহমদী প্রতিবেশীরাও আমাদের দেখে ভাল কিছু শিখতে পারে। আমাদেরকে তারা যেন প্রকৃত একজন মুসলমান বলতে পারে। ন্যাশনাল আমীর সাহেব গত কেন্দ্রীয় জলসায় যেভাবে বলেছিলেন– 'যেখানেই আমরা বসবাস করি না কেন আমরা যেন সেই স্থানের আদর্শ প্রতিবেশী হিসেবে আমাদেরকে সবাই পায় এবং আমাদের সম্পর্কে এই কথা কেউ না বলতে পারে যে, আমরা প্রতিবেশী হিসেবে মন্দ বা আমাদের আচরণ ভাল নয়।' তাই আমাদের আহমদীদের সর্বদা উত্তম দৃষ্টান্ত হওয়ার চেষ্টা করা দরকার।

আমাদেরকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেন কোন ভাবেই খারাপ কটুক্তি করতে না পারে সেরকমই আমাদের হওয়া উচিত। আহমদী মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন, **"যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয় সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।"** (কিশতিয়ে নূহ)

তিনি তাঁর রচিত পয়গামে সুলেহ্‌ পুস্তকে আরো বলেন, "আর যদি কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি হতে বঞ্চিত করে তবে তার ক্ষতি তাকেও ভোগ করতে হবে।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.) বলেন, "আল্লাহ্‌ তাআলা যখন বলেছেন, কুরবানী কর–এর সাথে এটাও বলেছেন, একে তিনটি ভাগে বিভক্ত কর। এর মধ্য থেকে একটি অংশ গরীবদের জন্য এবং একটি অংশ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য রেখে দাও। এ নির্দেশ এ কারণে, যেন স্মরণ থাকে যে এটি কেবল নিজ আত্মার অধিকার নয় বরং তোমাদের আত্মীয়-স্বজনেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। তা আদায়ও করা প্রয়োজন গরীবদেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে, তা আদায় করাও তোমাদের জন্য আবশ্যক। এ অধিকার সাধারণ অবস্থায়ও আদায় করতে হবে। সুখে-দু:খের সকল অবস্থার মাঝে এ অধিকার আদায় করতে হবে। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা-২০০৮)

পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে আমরা যদি জীবন গড়তে চাই এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন হতে চাই তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলার অন্যান্য নির্দেশের পাশাপাশি অবশ্যই আমাদেরকে প্রতিবেশীর হকও আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সকলকে প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর রাখার এবং তাদের দু:খ কষ্ট দুর করার তৌফিক দান করুন, আমীন

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর ৩৮ তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০০৯ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ তাআলার খাস ফজলে গত ১০-১২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর ৩৮ তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ইজতেমা শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষন প্রদান করেন মোহতরম নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ প্রফেসর মীর মোবাশের আলী। সভাপতির ভাষনে মোহতরম সদর সাহেব প্রত্যেক খাদেম ও তিফলকে ঐক্যের শৃংখলে আবদ্ধ থেকে ইবাদতে মনোযোগী হতে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। আহাদ পাঠের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

ইজতেমার ৩ দিনই নানাবিধ খেলাধুলা এবং তালিমী প্রতিযোগীতায় মুখর ছিল ইজতেমা প্রাঙ্গন। দেশের ৫৭টি মজলিস থেকে ছয় শতের অধিক খোদ্দাম ও আতফাল এতে অংশগ্রহন করেন।

১০ ডিসেম্বর বাদ মাগরিব 'আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কুরআন' শীর্ষক তরবিয়তী অধিবেশনে অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মওলানা আলহাজ্ব সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। এরপর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

১১ ডিসেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত হয় আতফাল সম্মেলন। মোহতামীম আতফাল জনাব মাহমুদ আহমদ বিপ্লব সাহেবের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সদর মজলিস স্বীয় উপস্থিতি দ্বারা আতফালদের উৎসাহিত করেন।

১১ ডিসেম্বর ২০০৯ বেলা ৩:৩০ মিনিটে মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর নসিহতমুলক বক্তব্য প্রদান করেন সাবেক ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব। সবশেষে সদর মজলিস সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর খেলাধুলা, তালিমী প্রতিযোগীতা ও সাংগঠনিক কাজের স্বীকৃতির পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ স্থানীয় মজলিস নির্বাচিত হওয়ায় বি বাড়িয়া মজলিসের কায়েদ সাহেবের হাতে 'লাওওয়ায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া' তুলে দেওয়া হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে এই তিনদিনের মিলনমেলা সমাপ্ত হয়।

মাহবুবুর রহমান

নাযেম ই আলা

৩৮তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা, ২০০৯

ঈদ পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপন

গত ৪ ডিসেম্বর ২০০৯ইং বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সিলেটে ঈদ পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোহাতরম মোহাম্মাদ ইকবাল চোধুরী প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সিলেট। প্রধান অতিথী হিসাবে ছিলেন জাকির হোসেন ভূঞা ক্রোড়া। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান চৌধুরী জেলা মোতামাদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহ: সিলেট। বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, একরামুল কবীর, আব্দুল বাতেন, মোহাম্মদ জাকির হোসেন ভুঞা এবং সভাপতি সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপনী টানা হয়। ঈদ পুণর্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন মোট ২১ জন সদস্য/সদস্যা। উপস্থিত সবাইকে মিষ্টি বিতারণ করা হয়।

সোহেল আহমদ

নাখালপাড়া হালকায় এমটিএ-তে 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানটি প্রদর্শন

গত ৩১ ডিসেম্বর ও ০১, ০২ এবং ০৩ জানুয়ারী ২০১০, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিজস্ব টিভি চ্যানেল এমটিএ-তে লন্ডন থেকে সরাসরি ২য় বারের ন্যায় "সত্যের সন্ধানে" নামে যে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় তা অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকা জামা'তের নাখালপাড়া হালকাতেও দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। নাখালপাড়া মসজিদসহ আরও ৬ টি বাসায় এ অনুষ্ঠান দেখানো হয়। চারদিনের এই আকর্ষনীয় অনুষ্ঠানে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২০জন করে অ-আহমদী সদস্য দেখেন, এছাড়া আহমদী গড়ে প্রায় ৪০/৫০জন দেখেন। অ-আহমদীগণ প্রতিদিন সরাসরি বিভিন্ন প্রশ্নও রাখেন। এমন সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আহমদীয়া জামা'তকে সবাই ধন্যবাদ জানান। আমরা আশা করি, আগামি অনুষ্ঠানগুলোতে আরও অনেক বেশি অ-আহমদী সদস্য এ অনুষ্ঠান উপভোগ করতে আসবেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগের দিন ১ হাজার দাওয়াত কার্ড নাখালপাড়ায় অবস্থানরত লোকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

নাখালপাড়া মসজিদে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে ২০১০ সালকে বরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয় তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মধ্য দিয়ে। এতে নাখালপাড়ার সদস্যগণ আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাহাজ্জুদ নামায পড়ান স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন সাহেব। নামাজ শেষে সবাই বুকে বুক মিলেয়ে সবার জন্য নতুন বছর সব দিক থেকে যেন কল্যাণ মন্ডিত হয় সেই দোয়া কামনা করেন।

মোহাম্মদ কামরুল আহসান

ময়মনসিংহ জামা'তে ওয়ার্কসব

গত ২৪/১১/০৯ইং মোহতরম মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী বাংলাদেশের সভাপতিত্বে ওয়ার্কসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সেক্রেটারীদের কাছে স্ব স্ব জামা'তের রিপোর্ট শুনা হয়। বিশেষকরে বাজেটের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, তালিম তরবিয়ত, রিশতানাতা সহ অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। তার পর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন বিষয়ে পরার্মশ প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

ফুলবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২০/১১/০৯ইং বাদ আছর হতে এশা পর্যন্ত এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন মওলানা জাফর আহমদ, মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর খান সাহেব, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ চরসিন্দুরে তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর ও ১, ২ জানুয়ারী ২০১০, ৩ দিন ব্যাপী স্থানীয় তালিম ও তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় তালিম তরবিয়তী সিলেবাস অনুযায়ী এ ক্লাস পরিচালিত হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের সকল সদস্য এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ চরসিন্দুরের উদ্যোগে তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্য দিয়ে ইংরেজী নববর্ষ বরণ

চরসিন্দুর জামা'তের ব্যবস্থাপনায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের সদস্যাগণ ইংরেজী নববর্ষ ২০১০কে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে বরণ করে। দোয়া করা হয় নববর্ষ যেন ইসলাম তথা আহমদীয়াত এবং প্রত্যেক আহমদীর জন্য অনেক বরকতের কারণ হয়।

রিপা মাহমুদ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে মেহেদী উৎসব পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ২৭-১১-২০০৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ পবিত্র ঈদু-উল-আযহা উপলক্ষে এক মেহেদী উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ গ্রহণকারিণী সকল সদস্যার মাঝে হাতে মেহেদী পরিয়ে দেন আয়শা সিদ্দিকা বিপাশা, রেজওয়ানা আহমদ শম্পা, সুরাইয়া নাসের তুলি, তাহমিনা আহমদ

(মিতু) উৎসবে ২৭ জন লাজনা ও ১০ জন নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

শুভ বিবাহ

* গত ২০/১১/০৯ইং মোছা: তারানা হক, পিতা-মোহাম্মদ শামসুল হক, ২০-এ/বি প্রথম কলোনী গাবতলী, মাজার রোড, মিরপুর এর সাথে সৈয়দ মোহাম্মদ কামরুল হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ রুহুল আমীন, নিকেতন আবাসিক গুলশান এর বিবাহ ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮১৪/০৯

* গত ১১/১২/০৯ইং মোছা: নওশিন আনজুম, পিতা- মরহুম আশরাফুজ্জামান, কুলগাঁও, জালালাবাদ, চট্টগ্রাম এর সাথে মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, পিতা-শাহ আকিল আহমদ, গ্রাম কিদিরপুর, ভীমখালি বাজার সুনামগঞ্জ এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (এক লক্ষ্য পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮১৫/০৯

* গত ০১/১২/০৯ইং মোছা: লিপি বেগম, পিতা-জনাব আবু-সাঈদ মিঞা, তাকসা আশুগঞ্জ, বি, বাড়ীয়া এর সাথে শফিক আহমদ খাঁন, পিতা-জনাব শফিক হোসেন খান, কালিয়া পুকুর ঘোড়ামারা রাজশাহী এর বিবাহ ১,৫০,০০১/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮১৬/০৯

* গত ০৪/১২/০৯ইং মোসাম্মৎ রোকসানা আক্তার রিকু -পিতা মোহাম্মাদ আব্দুর রশিদ, ১৯/১ নগর খানপুর নারায়ণগঞ্জ এর সাথে আহমদ তারেক, পিতা-জনাব মোহাম্মাদ ফজলুর রহমান, ঢাকা এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮১৭/০৯

* গত ৩০/১১/০৯ইং মোছা: বুশরা আহমেদ (আলো), পিতা-জনাব বশির আহমদ খাদেম, খরমপুর, আখাউরা, বি,বাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মাদ মকবুল আহমদ (সুজন) পিতা-শরীফ আহমদ ঘাটুরা, বি, বাড়ীয়া এর বিবাহ ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন ৮১৮/০৯

* গত ২৫/০৯/০৯ইং মোছা: রিমা আক্তার, পিতা-মৃত আবুল কালাম, কান্দিপাড়া এর সাথে মোহাম্মদ তাহের মিয়া, পিতা-মৃত ফজলুর রহমান বি. বাড়িয়া এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮১৮/০৯

* গত ০৯/১০/০৯ মোছা; সাদিয়া হক মৌসুমী পিতা-মোহাম্মাদ নিজামুল হক মোড়াইল, বি. বাড়ীয়া এর সাথে সৈয়দ জোবায়ের আহমদ, পিতা-মরহুম সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম মোড়াইল বি বাড়ীয়া এর বিবাহ ১,২০,০০১/- (এক লক্ষ বিশ হাজার এক) টাকা মোহারানায় সুসম্পন্ন হয়
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮১৯/০৯

* গত ০৮/১০/০৯ইং মোছা: জেমিয়া পারভীন পিতা-মোফাজ্জল হোসেন, গ্রাম তারুয়া, বি. বাড়িয়ার সাথে জনাব জোবায়ের আহমদ রতন, পিতা-সিদ্দিক আহমদ খালেদ, কান্দিপাড়া, বি. বাড়ীয়া এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮২০/০৯

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ১২/১২/২০০৯ইং রোজ শনিবার দুপুর ৩-৩০ মি: এর সময় নারায়ণগঞ্জ জামা'তের মরহুম কেরামত আলী সাহেবের পুত্র ফজলুর রহমান (ফজলু) ৩৪ বছর বয়সে জটিল শারিরীক রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার অকাল মৃত্যুতে তার ভাই বোন, আত্মীয়-স্বজন মর্মাহত।
আল্লাহ্ তাআলা যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জন্যও খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাদের সবাইকে সাবরে জামিল ও ধৈর্য্যধারন করার ক্ষমতা দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী
জহির উদ্দিন আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

প্রকাশিত হয়েছে–
"আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা"

তথ্যবহুল ও ইতিহাস সমৃদ্ধ মূল্যবান এ স্মরণিকাটি সুদৃশ্য ও মনোরম ছবি সম্বলিত এবং সুখপাঠ্য প্রবন্ধে সমৃদ্ধ
এটি পাঠ করুন ও নিজের সংগ্রহে রাখুন

যোগাযোগ :
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
সেল ফোন : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯, ০১৯১৮-৩০০১৫৬

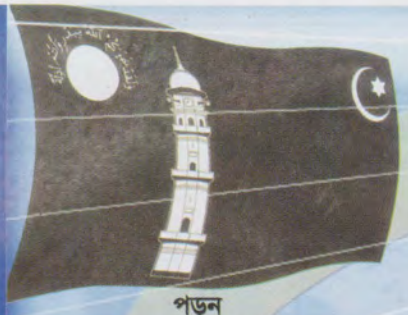

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

www.ahmadiyyabangla.org

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও তাঁর সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু

পড়ুন

সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা
অমূল্য পুস্তকাদি
অমূল্য প্রবন্ধ
পাক্ষিক আহমদী
অন্যান্য প্রকাশনা

শুনুন

ঈমান উদ্দীপক বাংলা হামদ্, নাত ও অন্যান্য বাংলা নযম/কবিতা
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান *(আসবে)*
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) *(আসবে)*
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ *(আসবে)*
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান *(আসবে)*

দেখুন

সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান *(আসবে)*
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) *(আসবে)*
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ *(আসবে)*
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান *(আসবে)*

আপনাদের দোয়া ও মূল্যবান মতামতের মাধ্যমে এ মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করুন

মতামত পাঠানোর ঠিকানা: info@ahmadiyyabangla.org

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

তুমি তখনই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হবে,
যখন তুমি তার বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে
-আল হাদীস

গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

COMPLETE VIEW OF
ADVANCED INDOOR
OUTDOOR SIGNAGE
& POP SYSTEMS

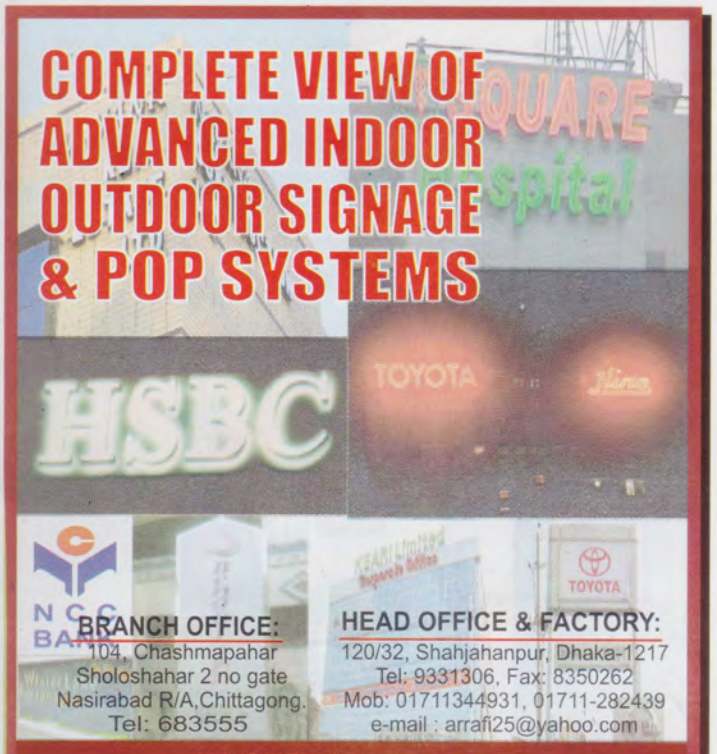

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong.
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

ধানসিড়ি
১০০% খাঁটি
সরিষার তৈল

ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈলের গুণাবলী

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নতমানের সরিষা থেকে ঘানিতে প্রস্তুতকৃত **ধানসিড়ি** খাঁটি সরিষার তৈল। ফুডগ্রেড পি ই টি বোতলে বাজারজাত করা হয়। **ধানসিড়ি** খাঁটি সরিষার তৈল কোলেস্টেরলমুক্ত তাই এটি স্বাস্থ্যকর।

খাঁটি
গাওয়া ঘি
ধানসিড়ি

ধানসিড়ি খাঁটি গাওয়া ঘি-এর গুনাবলী

গরুর দুধের টাটকা ক্রীম দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী। পোলাও, বিরিয়ানী, কোরমা, হালুয়া বা যে কোন সুস্বাদু খাদ্য তৈরীতে **ধানসিড়ি** গাওয়া ঘি অতুলনীয়।

ধানসিড়ি
রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি
খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printig

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz

Specialist in Making Metal Crest, Trophy, Medal, Silver/Gold Coated Dish Model, Coat Pin, Key Ring, Plastic Sign, Poly Sign, Wooden & SS Febrication

A Home of Quality Crest Trophy & Gift Items

DHAKA HEAD OFFICE
H - 79, Block # H / 11 (1st Floor), Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

Printed and Published by Mahbub Hossain at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com